ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের পর্যালোচনা

ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার

ঐতিহাসিক রেলধর্মঘটের পর্যালোচনা

বিশ লক্ষ রেল শ্রমিক কর্মচারীর মরণপণ আন্দোলন একটা আপোষকামী, বুর্জোয়া সংস্কারবাদী, দুর্বলচিত্ত ও চরম দেউলিয়া নেতৃত্বের জন্য শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের ব্যর্থতা নিয়ে এসেছে। এই নেতৃত্ব শ্রমিক-কর্মচারীদের কোন দাবী আদায় দূরের কথা, যেভাবে সরকারী হিংস্র ফ্যাসিষ্ট দমননীতির সামনে তাদের সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে একতরফা ও বিনাসর্তে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছে, তাকে চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

আন্দোলনের বিরাট সম্ভাবনা ছিল

এবারের রেল ধর্মঘট ভাঙ্‌বার জন্য চূড়ান্ত দমনপীড়নের যে রাস্তা ইন্দিরা সরকার গ্রহণ করেছিল, ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এত ব্যাপকতায় এ জিনিষ ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটেনি। এমনকি, বৃটিশ শাসনের অধীনেও মানুষ কোনদিন এ জিনিষ কল্পনা করতে পারেনি। অথচ, সরকারের সমস্ত রকম ভয়ভীতি ও অত্যাচার উপেক্ষা করে রেল শ্রমিক-কর্মচারীগণ এবারের ধর্মঘটে যে সংগ্রামী মনোবল, সংহতি ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা অভূতপূর্ব। দ্বিতীয়তঃ, এবারের রেল ধর্মঘট অন্যান্যবারের মত ক্যাটেগোরি ভিত্তিক খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন চরিত্রের ছিলনা। এবার বিশ লক্ষ রেল কর্মচারী—যারা জাতীয় জীবনের আর্টারিকে, অর্থাৎ দেশের প্রাণ-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে—এবং তাদের পরিবারবর্গসহ সত্তর লক্ষ মানুষ দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একসাথে পাথরের মত ঐক্য নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তৃতীয়তঃ, এই রেল ধর্মঘট সুরু হয়েছিল এমন একটা সময়ে, যখন দেশজোড়া অর্থনৈতিক সংকট সরকারী সমস্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে ক্রমাগত তীব্র রূপ ধারণ করছে এবং তার সাথে সর্বাত্মক প্রশাসনিক দুর্নীতি মিলে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ফলে, কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে প্রায়ই এখানে সেখানে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ ফেটে পড়ছিল এবং ইন্দিরা গান্ধী ও তার সরকার অল্প

আয়াসে অর্জিত সমস্ত জনপ্রিয়তা হারিয়ে দেশের মানুষ থেকে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। চতুর্থতঃ, সরকারী সমস্ত অপপ্রচার ব্যর্থ করে এবং নানা অসুবিধা সহ্য করেও দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ এবারের রেল ধর্মঘটকে যেভাবে আগাগোড়া অকুণ্ঠভাবে সমর্থন জানিয়ে গিয়েছে, তার নজীরও সচরাচর মেলে না। পঞ্চমতঃ, এবার রেল ধর্মঘটের সপক্ষে জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, বৃটেন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের সংগঠনগুলি যেভাবে সংহতি প্রকাশ করেছে এবং ভারত সরকারকে সমস্ত দমননীতি বন্ধ করে রেলশ্রমিকদের সাথে সম্মানজনক মীমাংসায় আসার জন্য দাবী জানিয়ে বিভিন্ন সময়ে বার্তা পাঠিয়েছে, ইতিপূর্বে এদেশের কোন আন্দোলনে আন্তর্জাতিক সংহতির এমন প্রকাশ দেখা যায়নি। অথচ, রেল ধর্মঘটের সপক্ষে সমস্ত দিক থেকে এরকম একটি অনুকূল পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তা এমন শোচনীয় পরিণতি লাভ করল কেন, ভবিষ্যৎ শ্রমিক আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে তা বিচার করার প্রয়োজন আছে।

গণআন্দোলন সম্পর্কে নেতৃত্বের দৃষ্টিভংগী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন

বিপুল সম্ভাবনাময় এতবড় একটা রেল ধর্মঘটে এস পি, সি পি আই এবং সি পি আই (এম)—যারা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে আচরণ করেছে এবং যে দৃষ্টিভংগী প্রতিফলিত করেছে, তাতে গণআন্দোলন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভংগী আজ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার সময় এসেছে। রেল ধর্মঘটে এদের আচরণ এবং দৃষ্টিভংগী আর একবার এই সত্যকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করেছে যে, এই দলগুলি নেতৃত্ব বজায় রাখবার জন্য জনগণের আশু দাবীদাওয়া নিয়ে কিছু লড়ালড়ি করে ঠিকই, কিন্তু তাও করে বেশী কিছু ঝুঁকি বা বিপদ ঘাড়ে না নিয়ে এবং রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে তেমন কোন বিরোধ ডেকে না এনে। আর, এই লড়াইগুলোর মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সরকার বিরোধী যে মনোভাব জনতার মধ্যে সৃষ্টি হয়, এই দলগুলি তাকেই ব্যবহার করে শেষপর্যন্ত পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে তার ফয়দা ওঠায়। এর বেশী কিছু নয়। এমনকি, সি পি আই এবং সি পি আই (এম)-এর ভূমিকাও যদি এই রেল ধর্মঘটে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, আমাদের পার্টি প্রথম থেকেই এই দুটি দল সম্পর্কে যে কথা বলে এসেছে যে, এরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং বৈজ্ঞানিক

সমাজতন্ত্রবাদের যে কথাই বলুক, এরাও আসলে সোসাল ডেমোক্র্যাট, যারা সমস্ত চরম মুহূর্তেই কোন না কোন ছুতায়, কখনও মিথ্যা থিওরী দিয়ে, কখনও সাবোটাজ করে, কখনও ভিতর থেকে বিনষ্ট করে গণআন্দোলনকে তার যথাযথ পরিণতির দিকে যেতে দেয় না এবং শ্রম এবং পুঁজির মূল দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মধ্যে আপোষকামী শক্তি হিসাবে কাজ করে, তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে।

প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক প্রস্তুতি করা হয়নি

গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, আন্দোলনের কোন স্তরেই এই নেতৃত্ব গুরুত্ব সহকারে রেল শ্রমিকদের সংগ্রাম পরিচালনা করতে চায়নি। বরং, প্রথম থেকেই এমন একটি মনোভাব পোষণ করেছে এবং বারবার প্রকাশ করেছে যে, রেল ধর্মঘট হয়তো শেষপর্যন্ত করতেই হবেনা, আর ধর্মঘট হলেও রেলের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে ধর্মঘট চার পাঁচ দিনের বেশী স্থায়ী হবেনা। এমনকি, এই নেতৃত্ব এবারের রেল ধর্মঘটে প্রথম থেকেই সরকারের দুরভিসন্ধি পর্যন্ত ধরতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং যে সরকার রেল ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে এত বড় একটা চক্রান্ত করেছে, তার সাথেই আপোষ-আলোচনার ভিত্তিতে একটা মীমাংসায় যাবার মোহ আগাগোড়া পোষণ করেছে। অথচ, বিগত ফেব্রুয়ারী মাসেই একেবারে গোড়ায় আন্দোলনের প্রস্তুতিকল্পে অনুষ্ঠিত দিল্লী সম্মেলনে ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী)'র পক্ষ থেকে কমরেড প্রীতিশ চন্দ, সরকার যে প্রচণ্ড আক্রমণের দ্বারা এবারের রেল ধর্মঘটকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছে, সে সম্পর্কে নেতৃত্বকে হুঁসিয়ার করে দিয়েছিলেন। তিনি হুঁসিয়ারী দিয়ে একথাও বলেছিলেন যে, এবারের আন্দোলন কঠোর এবং দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। সুতরাং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার প্রতি কোন মোহ না রেখে এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে তেমন কোন মোহ সৃষ্টি না করে একদিকে কর্মীদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের মানসিকতা তৈরী করা এবং অন্যদিকে উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যবস্থা করার দিকে তিনি নেতৃত্বের দৃষ্টি বারবার আকর্ষণ করেছিলেন। এই সংগঠনের প্রকৃতি সম্পর্কেও তিনি সেদিন বলেছিলেন যে, এই সংগঠন শুধু ওপর তলার একটা সংগ্রাম কমিটি করলেই হবে না, ওপর থেকে একেবারে নীচু পর্যন্ত সর্বস্তরে এই সংগ্রাম কমিটিগুলি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে সরকারী অত্যাচারের মুখেও কর্মীরা নিজেদের মধ্যে এবং

নেতৃত্বের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করতে এবং প্রতিদিনের কর্মসূচী-গুলিকে সম্মিলিত ও সংগঠিতভাবে বাস্তবে রূপ দিয়ে প্রয়োজনমত আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপকতর করতে সক্ষম হয়। কিন্তু, বারবার হুঁসিয়ারী দেওয়া সত্ত্বেও সেদিন তার এই প্রস্তাবে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত এই তিনটি দলের কোন দলই কর্ণপাত করেনি এবং কোন সময়েই এই নেতৃত্ব প্রয়োজনীয় সংগঠন ও প্রস্তুতি গড়ে তুলে আন্দোলন এমন কায়দায় পরিচালনা করতে চায়নি, যার দ্বারা সম্মান-জনক মীমাংসায় না আসা পর্যন্ত আন্দোলনকে ধাপে ধাপে শক্তিশালী, ব্যাপকতর ও দীর্ঘস্থায়ী করে সরকারের ওপর উপযুক্ত চাপ সৃষ্টি করা যায় এবং আন্দোলনকে নতুন উন্নত রাজনৈতিক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া যায়। এমনকি, যে সি পি আই(এম) নেতারা আজ রেল ধর্মঘটের ব্যর্থতার সব দায়দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন, তারাও এ ব্যাপারে কোন পৃথক দৃষ্টিভংগী সেদিন উপস্থিত করেননি। তারা বরং এই সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে সেদিন ফার্ণাণ্ডেজকে তোয়াজ করতেই বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, অথবা তাদের ভাষায় বলা যায়, ফার্ণাণ্ডেজকে 'ট্যাকল্' করতেই সেদিন তারা ব্যগ্র ছিলেন।

নেতৃত্বের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় এই সাংগঠনিক প্রস্তুতিটি না গড়ে তোলার জন্যই দেখা গেছে, ধর্মঘট সুরু হওয়ার পর লক্ষ লক্ষ রেল শ্রমিক-কর্মচারীর, কি নেতৃত্বের সঙ্গে, কি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাছাড়া, ইউনিয়নের মধ্যে কর্মরত এই সমস্ত দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একটা অংশ ধর্মঘট সুরু হওয়ার আগেই জেলের নিরাপদ অবস্থানে চলে গিয়েছিলেন, আর যারা বাইরে ছিলেন তারাও আত্মগোপনের এমন রাস্তা নিয়েছিলেন যে, ধর্মঘট সুরু হওয়ার পর কর্মীদের সঙ্গে তারা কোন যোগাযোগই রাখেন নি। ফলে, নিজস্ব উদ্যোগে সাহসের সাথে সরকারী আক্রমণের বিরুদ্ধে মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া সরকারী দমনপীড়ন ও ক্রমাগত মিথ্যা-প্রচারের সামনে কর্মচারীরা ছিলেন সম্পূর্ণ অসহায়। যোগাযোগবিহীন, নেতৃত্ব-বিহীন রেল কর্মচারীদের সামনে প্রতিদিনের আন্দোলনের কোন কর্মসূচীও ছিল না। অথচ, সংগঠন ও নেতৃত্ব সঠিক থাকলে বিশ লক্ষ রেল শ্রমিক এবং তাদের পরিবার মিলে সত্তর লক্ষ মানুষ এবারের ধর্মঘটে যে মনোবল এবং সাহস দেখিয়েছিল, তাতে প্রতিদিন কর্মসূচী দিয়ে তাদের কাজে লাগাতে পারলে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিদিন পরিকল্পনা অনুযায়ী অংশ গ্রহণ আন্দোলনকে অভূতপূর্ব-ভাবে শক্তিশালী করতে পারত।

রেলধর্মঘটে সরকারী দুরভিসন্ধি ধরতে নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছে

এই নেতৃত্ব ধর্মঘট সম্পর্কে ইন্দিরা সরকারের দুরভিসন্ধি পূর্বাহ্ণেই ধরতে যে শুধু ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, এমনকি ধর্মঘটের নোটিশ দেবার পর সরকারী কার্যকলাপ দেখেও তা ধরতে পারেনি। তারা এটা ধরতেই পারেনি যে, যে সরকার লোকো কর্মী ধর্মঘটের সময়ে আলাপ-আলোচনায় মীমাংসা করেছে, নিজেরা পয়সা খরচ করে আন্দোলনের নেতাদের প্লেনে করে দিল্লী নিয়ে গিয়ে কথাবার্তা বলেছে, সেই সরকারই এবারে আলাপ-আলোচনা চলার সময়েই আন্দোলনের নেতা ও সংগঠকদের জেলে পুরে, হাজার হাজার কর্মী ও সংগঠককে গ্রেপ্তার করে নিজেরাই আলোচনার সমস্ত দরজা বন্ধ করেছে এবং এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যাতে রেল শ্রমিকদের মাথা নিচু করে আত্মসমর্পণ করতে হয়, অথবা তাদের ধর্মঘটের দিকে যেতে হয়। ইন্দিরা সরকার কেন একাজ করেছিল, তা কি এই নেতৃত্ব ধরতে পেরেছিল? যদি সরকারের দুরভিসন্ধি তারা ধরতে পেরে থাকে, তাহলে তাদের নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য ছিল আন্দোলনের উপযুক্ত প্রস্তুতি করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। কারণ, বুঝতে পেরে সেটা না করার অর্থ হল চরম বিশ্বাসঘাতকতা, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, বহু সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার সরকারী ষড়যন্ত্রকেই কার্যকরী করতে সাহায্য করা। আর, যদি তারা এ জিনিষ না ধরতে পেরে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, এই নেতৃত্ব অজ্ঞ এবং চরম মূর্খ, যাদের কোন অধিকার নেই রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার।

সরকারী দুরভিসন্ধি সম্পর্কে ধর্মঘট চলার আগে বারবার হুঁসিয়ারী দেওয়া সত্ত্বেও যখন এই দলগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না, এমনকি ধর্মঘট সুরু হওয়ার পর সরকারী কার্যকলাপ দেখেও নেতাদের চৈতন্য হলনা, তখন আমরা আমাদের ইংরাজী মুখপত্র 'প্রোলেটারিয়ান এরা'র ১৫ই মে'র সংখ্যায় সরকারী চক্রান্ত সম্পর্কে নেতৃত্বকে আবার হুঁসিয়ার করে দিই। সরকারী দুরভিসন্ধি সম্পর্কে 'প্রোলেটারিয়ান এরা'য় বিস্তৃতভাবে আমরা তখন যা বলেছিলাম, সংক্ষেপে তার মূল বক্তব্য ছিল যে, দীর্ঘদিন থেকেই রেল কর্তৃপক্ষের চরম অযোগ্যতা, সীমাহীন দুর্নীতি ও ভুল পরিকল্পনার ফলে প্রয়োজনীয় ষ্টীম ইঞ্জিনের অভাবে রেলের মাল পরিবহন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়বার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। এর ফলে শিল্প-কারখানাগুলিতে কয়লা ও কাঁচামাল সরবরাহ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল এবং ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্প-কারখানায় শিল্পজাত উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে জমে গিয়েছিল, এবং কয়লাখনিগুলিতে কয়লাও স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে-

নেতৃত্বের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করতে এবং প্রতিদিনের কর্মসূচী-গুলিকে সম্মিলিত ও সংগঠিতভাবে বাস্তবে রূপ দিয়ে প্রয়োজনমত আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপকতর করতে সক্ষম হয়। কিন্তু, বারবার হুঁসিয়ারী দেওয়া সত্ত্বেও সেদিন তার এই প্রস্তাবে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত এই তিনটি দলের কোন দলই কর্ণপাত করেনি এবং কোন সময়েই এই নেতৃত্ব প্রয়োজনীয় সংগঠন ও প্রস্তুতি গড়ে তুলে আন্দোলন এমন কায়দায় পরিচালনা করতে চায়নি, যার দ্বারা সম্মান-জনক মীমাংসায় না আসা পর্যন্ত আন্দোলনকে ধাপে ধাপে শক্তিশালী, ব্যাপকতর ও দীর্ঘস্থায়ী করে সরকারের ওপর উপযুক্ত চাপ সৃষ্টি করা যায় এবং আন্দোলনকে নতুন উন্নত রাজনৈতিক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া যায়। এমনকি, যে সি পি আই(এম) নেতারা আজ রেল ধর্মঘটের ব্যর্থতার সব দায়দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন, তারাও এ ব্যাপারে কোন পৃথক দৃষ্টিভংগী সেদিন উপস্থিত করেননি। তারা বরং এই সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে সেদিন ফার্ণাণ্ডেজকে তোয়াজ করতেই বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, অথবা তাদের ভাষায় বলা যায়, ফার্ণাণ্ডেজকে 'ট্যাক্‌ল্' করতেই সেদিন তারা ব্যগ্র ছিলেন।

নেতৃত্বের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় এই সাংগঠনিক প্রস্তুতিটি না গড়ে তোলার জন্যই দেখা গেছে, ধর্মঘট সুরু হওয়ার পর লক্ষ লক্ষ রেল শ্রমিক-কর্মচারীর, কি নেতৃত্বের সঙ্গে, কি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাছাড়া, ইউনিয়নের মধ্যে কর্মরত এই সমস্ত দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একটা অংশ ধর্মঘট সুরু হওয়ার আগেই জেলের নিরাপদ অবস্থানে চলে গিয়েছিলেন, আর যারা বাইরে ছিলেন তারাও আত্মগোপনের এমন রাস্তা নিয়েছিলেন যে, ধর্মঘট সুরু হওয়ার পর কর্মীদের সঙ্গে তারা কোন যোগাযোগই রাখেন নি। ফলে, নিজস্ব উদ্যোগে সাহসের সাথে সরকারী আক্রমণের বিরুদ্ধে মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া সরকারী দমনপীড়ন ও ক্রমাগত মিথ্যা-প্রচারের সামনে কর্মচারীরা ছিলেন সম্পূর্ণ অসহায়। যোগাযোগবিহীন, নেতৃত্ব-বিহীন রেল কর্মচারীদের সামনে প্রতিদিনের আন্দোলনের কোন কর্মসূচীও ছিল না। অথচ, সংগঠন ও নেতৃত্ব সঠিক থাকলে বিশ লক্ষ রেল শ্রমিক এবং তাদের পরিবার মিলে সত্তর লক্ষ মানুষ এবারের ধর্মঘটে যে মনোবল এবং সাহস দেখিয়েছিল, তাতে প্রতিদিন কর্মসূচী দিয়ে তাদের কাজে লাগাতে পারলে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিদিন পরিকল্পনা অনুযায়ী অংশ গ্রহণ আন্দোলনকে অভূতপূর্ব-ভাবে শক্তিশালী করতে পারত।

রেলধর্মঘটে সরকারী দুরভিসন্ধি ধরতে নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছে

এই নেতৃত্ব ধর্মঘট সম্পর্কে ইন্দিরা সরকারের দুরভিসন্ধি পূর্বাহ্নেই ধরতে যে শুধু ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, এমনকি ধর্মঘটের নোটিশ দেবার পর সরকারী কার্যকলাপ দেখেও তা ধরতে পারেনি। তারা এটা ধরতেই পারেনি যে, যে সরকার লোকো কর্মী ধর্মঘটের সময়ে আলাপ-আলোচনায় মীমাংসা করেছে, নিজেরা পয়সা খরচ করে আন্দোলনের নেতাদের প্লেনে করে দিল্লী নিয়ে গিয়ে কথাবার্তা বলেছে, সেই সরকারই এবারে আলাপ-আলোচনা চলার সময়েই আন্দোলনের নেতা ও সংগঠকদের জেলে পুরে, হাজার হাজার কর্মী ও সংগঠককে গ্রেপ্তার করে নিজেরাই আলোচনার সমস্ত দরজা বন্ধ করেছে এবং এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যাতে রেল শ্রমিকদের মাথা নিচু করে আত্মসমর্পণ করতে হয়, অথবা তাদের ধর্মঘটের দিকে যেতে হয়। ইন্দিরা সরকার কেন একাজ করেছিল, তা কি এই নেতৃত্ব ধরতে পেরেছিল? যদি সরকারের দুরভিসন্ধি তারা ধরতে পেরে থাকে, তাহলে তাদের নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য ছিল আন্দোলনের উপযুক্ত প্রস্তুতি করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। কারণ, বুঝতে পেরে সেটা না করার অর্থ হল চরম বিশ্বাসঘাতকতা, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, বহু সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার সরকারী ষড়যন্ত্রকেই কার্যকরী করতে সাহায্য করা। আর, যদি তারা এ জিনিষ না ধরতে পেরে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, এই নেতৃত্ব অজ্ঞ এবং চরম মূর্খ, যাদের কোন অধিকার নেই রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার।

সরকারী দুরভিসন্ধি সম্পর্কে ধর্মঘট চলার আগে বারবার হুঁসিয়ারী দেওয়া সত্ত্বেও যখন এই দলগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না, এমনকি ধর্মঘট সুরু হওয়ার পর সরকারী কার্যকলাপ দেখেও নেতাদের চৈতন্য হলনা, তখন আমরা আমাদের ইংরাজী মুখপত্র 'প্রোলেটারিয়ান এরা'র ১৫ই মে'র সংখ্যায় সরকারী চক্রান্ত সম্পর্কে নেতৃত্বকে আবার হুঁসিয়ার করে দিই। সরকারী দুরভিসন্ধি সম্পর্কে 'প্রোলেটারিয়ান এরা'য় বিস্তৃতভাবে আমরা তখন যা বলেছিলাম, সংক্ষেপে তার মূল বক্তব্য ছিল যে, দীর্ঘদিন থেকেই রেল কর্তৃপক্ষের চরম অযোগ্যতা, সীমাহীন দুর্নীতি ও ভুল পরিকল্পনার ফলে প্রয়োজনীয় ষ্টীম ইঞ্জিনের অভাবে রেলের মাল পরিবহন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়বার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। এর ফলে শিল্প-কারখানাগুলিতে কয়লা ও কাঁচামাল সরবরাহ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল এবং ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্প-কারখানায় শিল্পজাত উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে জমে গিয়েছিল, এবং কয়লাখনিগুলিতে কয়লাও স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে-

ছিল। পুঁজিবাদী অর্থনীতি-জনিত কারণে এমনিতেই আমাদের দেশে শিল্পে যে মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে তা আরও ভীষণ এবং এমন তীব্র রূপ নিয়ে দেখা দিতে থাকে যে, এমনকি টাটা বিড়লা একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী পর্যন্ত রেল প্রশাসনের অযোগ্যতা নিয়ে তাদেরই সরকারের বিরুদ্ধে কিছুদিন থেকেই প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে সুরু করে এবং এ ব্যাপারে সরকারী অপদার্থতা একেবারে খোলাখুলি প্রকাশ হওয়ার মুখে এসে দাঁড়ায়। ঠিক এই অবস্থায় রেল ধর্মঘটের নোটিশের মধ্য দিয়ে সরকার নিজেদের সমস্ত অযোগ্যতাকে ধর্মঘটী রেল শ্রমিকদের ওপর চাপাবার একটা হীন সুযোগ খুঁজে পায়। তারা এর দ্বারা এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চাইলেন। একদিকে তারা দেখলেন, এই ধর্মঘটের মধ্যে শ্রমিকদের ফাঁসিয়ে দিতে পারলে রেল প্রশাসনের সমস্ত ব্যর্থতাকে শুধু বর্তমানেই তারা চাপা দিতে পারবেন তাই নয়, অন্ততঃ ভবিষ্যতে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এই অজুহাত দেখিয়ে তারা তাদের ব্যর্থতার সাফাই গাইতে পারবেন। অন্যদিকে ধর্মঘটের অজুহাতে যাত্রীদের অসুবিধা ভোগ করার একটা কৈফিয়ত তৈরী করে ২৮-২৯ শে এপ্রিল থেকেই প্রচুর যাত্রীবাহী ট্রেন তারা বাতিল করতে সুরু করলেন, যেটা ধর্মঘটের নোটিশ না থাকলে যাত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টি করে তারা কখনই করতে পারতেন না। এইভাবে প্রায় চারশো মত দূর পাল্লার এবং সাধারণ যাত্রীবাহী ট্রেন যেগুলি তারা সেদিন বাতিল করেছিলেন, তার শতকরা আশী ভাগই ছিল ষ্টীম ইঞ্জিন পরিচালিত ট্রেন এবং বিপুল সংখ্যায় এই সমস্ত ট্রেন বাতিল করে সেই ইঞ্জিনগুলিকে সরকার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত মাল চলাচলের কাজে লাগাতে সুরু করেন এবং রেল ধর্মঘটের মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী, কয়লা ও কাঁচামাল স্টক করতে থাকেন। রেলের নেতাদের এ জিনিষ না জানা থাকার কথা ছিল না। অথচ, এটা দেখেও সরকার কি চাইছে, সে সম্পর্কে নেতাদের চৈতন্য হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ, সরকার বুঝতে পারছিলেন, দেশের অর্থ নৈতিক সংকট যেভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, জনজীবনের কোন সমস্যাকেই সমাধান না করতে পারার ফলে সমগ্র দেশ জুড়ে অসন্তোষ যেভাবে তীব্র হয়ে দেখা দিচ্ছে, তাতে শুধু গুজরাট বা বিহারে নয়, গণবিক্ষোভ সংগঠিত রূপে হোক্, অসংগঠিত রূপে হোক্, নেতৃত্ব থাকুক বা না থাকুক, যে কোন মুহূর্তে দেশব্যাপী ফেটে পড়তে পারে। সেই অবস্থায় তার সাথে যদি আবার রেল শ্রমিকরা, যারা জাতীয় জীবনের আর্টারীকে কন্ট্রোল করে, তারা যুক্ত হয়, শিল্প-কারখানার শ্রমিকরা তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে সেই আন্দোলনে এগিয়ে আসে, তাহলে এই

সরকার টিকে থাকতে পারবেনা। তাই তেমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগেই সরকার রেল ধর্মঘটকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেয়েছে এই আশায় যে, প্রথমতঃ, রেল ধর্মঘটকে চূড়ান্ত দমন পীড়নের মধ্য দিয়ে বানচাল করে দিতে পারলে রেল-কর্মীরা অন্ততঃ বেশ কিছুদিনের জন্য মাথা তুলতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ, এর যে প্রভাব দেশের অন্যান্য শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পড়বে, তার ফলে তারাও অদূর ভবিষ্যতে আন্দোলনের কথা চিন্তা করতে পারবে না। তৃতীয়তঃ, রেলের অভ্যন্তরে যে দলের কর্মীদের এবং ব্যক্তিদের সরকার আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করে, তাদের ছাঁটাই করে দিয়ে পুরো রেল প্রশাসনকে তারা নির্ঝঞ্ঝাট করতে পারবে, এবং দলের সমর্থনে চাকরী দেবার জন্য যে সমস্ত বেকার যুবকদের সংগ্রহ করা হয়েছে, তার একটা অংশকে রেলকর্মীদের বরখাস্ত করে কাজ দেওয়া সম্ভব হবে।

নেতৃত্বের চরিত্র সম্পর্কে সরকার নিশ্চিন্ত হয়েই ঝুঁকি নিয়েছে

রেল ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে জাতীয় পরিস্থিতির ঠিক এই সময়ে ইন্দিরা সরকার এত বড় চক্রান্ত করার সাহস কোথেকে পেয়েছিল ? কারণ, এতবড় ঝুঁকি নেবার আগে সরকারকে এ কথাও ভাবতে হয়েছে যে, দেশজুড়ে জনসাধারণের বিক্ষোভ যে পর্যায়ে আছে, তাতে ধর্মঘটী রেল শ্রমিকরা নতি স্বীকার না করে যদি রেল ধর্মঘট চালিয়ে যায় এবং তার সমর্থনে দেশের সর্বস্তরের শ্রমিকশ্রেণী ও জন-সাধারণ এগিয়ে আসে, তাহলে একটা 'বিরাট কাণ্ড' ঘটে যেতে পারে এবং এ সরকার এখানেই পড়ে যেতে পারে। কারণ, এ ধর্মঘট সাধারণ ধর্মঘট ছিল না। এ ছিল রেলের শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট, যারা জাতীয় জীবনের আর্টারিকে কন্ট্রোল করে। আর, এ ধর্মঘটের পেছনে শ্রমিকদের মনোবল ও জনসমর্থনও ছিল এবারে অভূতপূর্ব। ফলে, এ ভয়ও এখানে ছিল। সরকার এ জিনিষ ভাবেনি, এত কাঁচা বুর্জোয়াদের মনে করার কোন কারণ নেই। তাহলে, এত বড় ঝুঁকি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের সাহস কে জুগিয়েছে ? সাহস জুগিয়েছে রেল ধর্মঘটের বর্তমান নেতৃত্বের চিরাচরিত দুর্বল এবং ইন্দিরা তোষণ নীতি। এই নেতৃত্বের ক্ষমতা কতটুকু এবং তাদের চরিত্র কি, তা তাদের হাজার বিপ্লবী বুকনী সত্ত্বেও তাদের আচরণ থেকেই ইন্দিরাজী ভালভাবে ধরতে পেরেছিলেন। ইন্দিরাজী যথার্থই ধরতে পেরেছিলেন যে, তিনি একটু দৃঢ় হলেই এই সব নেতারা ঝুঁকি নিয়ে রেল আন্দোলনকে গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে

তাকে ব্যাপকতর করার দিকে এগিয়ে যাবে না। এ সন্দেহ থাকলে ইন্দিরা সরকার এভাবে আচরণ করতে সাহস পেত না।

এমনকি, ইন্দিরা সরকার ২রা মে থেকে রেল ধর্মঘটের নেতাদের এবং রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক দলের নেতা ও সংগঠকদের গ্রেপ্তার করে যখন আক্রমণের প্রথম আঘাত হানে, তখন এই সমস্ত নেতারা সাথে সাথে ৩রা মে থেকেই রেল ধর্মঘটের আহ্বান দিয়ে যদি ইন্দিরা সরকারের আক্রমণের পাল্টা জবাব দিতেন, তাহলে তারপরেও ৭ই মে পর্যন্ত মালগাড়ী চলাচল অব্যাহত রেখে ধর্মঘট ভাঙ্‌বার প্রস্তুতিকে দৃঢ় করার যে সুযোগ সরকার পেয়েছিল, তা ব্যর্থ করে দেওয়া যেত, এবং নেতারা এইভাবে আচরণ করলে ইন্দিরা গান্ধীও এত বড় চক্রান্ত করতে দ্বিধাগ্রস্ত হতেন। ২রা মে রেল আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার করার সাথে সাথে স্বতস্ফূর্তভাবে রেল শ্রমিকরা বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন ধর্মঘটের দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, শ্রমিকরা তখন থেকেই লড়তে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু নেতাদের সে দূরদৃষ্টি ও সাহস ছিল না। তারা তখনও ইন্দিরা গান্ধীর বিবেচনার প্রতি আস্থা নিয়ে বসে ছিলেন এবং আলাপ-আলোচনা পুনরারম্ভ করার চেষ্টাতেই সমস্ত সময় নষ্ট করেছেন। এইভাবে প্রতিটি পদক্ষেপে নেতৃত্ব নিজেদের দুর্বলতা সেদিন সরকারের কাছে অত্যন্ত প্রকট করে তুলে ধরেছিলেন, যার ফলেই ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে ধর্মঘটী রেল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অনমনীয় এবং ডিক্টেটোরিয়াল মনোভাব গ্রহণ করতে এবং অত্যাচারের মাত্রা বাড়াতে সুবিধা হয়েছে।

সরকারী দমনপীড়নের সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্র

সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে এবং গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ পদদলিত করে ধর্মঘটী রেলকর্মীদের বিরুদ্ধে ইন্দিরা সরকার এবারে দমনপীড়নের নজিরবিহীন তাণ্ডবলীলাই শুধু চালায়নি, দমনপীড়নের ক্ষেত্রে এমন দু'টি পথ তারা গ্রহণ করেছিল, যা সভ্যতা ও গণতন্ত্র দূরের কথা, আজকের দুনিয়ায় যে কোন স্বৈরাচারী ও বর্বর শাসককেও লজ্জা দিতে পারে। অথচ, এই নেতৃত্ব এত দুর্বল এবং ইন্দিরা তোষণে এতই ব্যগ্র ছিল যে, সরকারী দমননীতির সেই বিশেষ চরিত্রটিকে তারা উদ্‌ঘাটিত তো করেই নি, বরং পাছে ইন্দিরাজী চটে যান সেইজন্য তা আড়াল করতেই সাহায্য করেছে। অথচ, তা উদ্‌ঘাটিত করলে এই একটি কাজের দ্বারাই ইন্দিরা গণতন্ত্রের আসল চেহারাটিকে এবং এই ধর্মঘটে ইন্দিরা সরকারের আসল উদ্দেশ্যটিকে তারা দেশের মানুষের কাছে তো বটেই, দুনিয়ার সামনেও তুলে ধরতে পারতেন। সরকার এবারে ধর্মঘটী রেলকর্মীদের পরিবার-

বর্গের ওপর পুলিশ-মিলিটারী ও প্রশাসন যন্ত্র দিয়ে অকথ্য অত্যাচার ছাড়াও, খবরে প্রকাশ, এই কাজের জন্য বাইরে থেকে গুণ্ডা, এমনকি প্রস্টিটিউট পর্যন্ত ভাড়া করেছিলেন এবং এই সমস্ত ভাড়াটে গুণ্ডা ও প্রস্টিটিউটরা কাঁচড়াপাড়ায় পুলিশ-মিলিটারীর সাহায্যে রেল কোয়ার্টার থেকে কুমারী মেয়েদের বাইরে টেনে নিয়ে এসে প্রকাশ্য রাস্তায় প্রায় বিবস্ত্র করে নারকীয় অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। এই সরকারই আবার প্রগতি ও গণতন্ত্রের কথা বলে!

দমনপীড়নের ক্ষেত্রে এহেন বর্বর রাস্তা ছাড়াও আর একটি হীন রাস্তা যা ইন্দিরা সরকার এবারে গ্রহণ করেছিল, তা হচ্ছে, সমস্ত রকমের মিথ্যা অপপ্রচার, উৎকোচ প্রদান, নজিরবিহীন দমনপীড়ন, মিলিটারী দিয়ে ট্রেন চালাবার চেষ্টা এবং পঞ্চাশ হাজার রেলকর্মীকে জেলে পুরেও যখন শ্রমিকদের মনোবল ভাঙতে সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ হয়, তখন তারা পুলিশ-মিলিটারী দিয়ে ঘেরাও করে করে শ্রমিকদের ধরতে থাকে এবং ধরে নিয়ে এসে জোর করে বণ্ড সই করিয়ে বেয়নেটের ডগায়, এবং এমনও শোনা গেছে, কোথাও কোথাও পায়ে শেকল বেঁধে পর্যন্ত তাদের কাজ করাতে বাধ্য করেছে। এই ভাবে এশিয়ার বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে মধ্যযুগীয় বর্বর দাসপ্রথার অনুরূপ ধর্মঘটী রেলশ্রমিকদের 'ফোর্সড লেবার' বা 'স্লেভ লেবার' হিসাবে কাজ করানোর যে নীতি অনুসরণ করেছেন, আজকের যুগে কোন চরম প্রতিক্রিয়াশীল বা ডিক্টেটরও তা চিন্তা করতে পারে না।

এই যে নিজের অধীনস্থ কর্মচারীদের পরিবারবর্গের মেয়েদের ওপর ভাড়া করা গুণ্ডা ও প্রস্টিটিউট দিয়ে অকথ্য অত্যাচার চালানো এবং ধর্মঘটী শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করে 'ফোর্সড লেবার' বা 'স্লেভ লেবার' হিসাবে কাজ করানো—অত্যাচারের এই প্রকৃতিকে শুধু চরম এবং বর্বর অত্যাচার বললেই কি বোঝানো যায়? বরং, অত্যাচারের এই প্রকৃতিকে আলাদাভাবে তুলে না ধরে শুধু সরকারী বর্বরোচিত আক্রমনের বিরুদ্ধে নিন্দা করলে, সাধারণভাবে পুলিশ-মিলিটারী দিয়ে অত্যাচারকেই বোঝানো হয় এবং সেই ক্ষেত্রে নিন্দার ভাষা যত তীব্রই হোকনা কেন, তার দ্বারা সরকারী অত্যাচারের উপরোক্ত প্রকৃতিকে আড়াল করতেই বাস্তবে সাহায্য করা হয়। যে দলগুলি রেল ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা ঠিক এই কাজটিই করেছেন। যেখানে দেশের ও দুনিয়ার মানুষের সামনে অত্যাচারের এই দু'টি দিককে বিশেষভাবে তুলে ধরে ইন্দিরা সরকারের আসল চরিত্রটিকে তাদের খুলে দেওয়া উচিত ছিল এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র জনমত সৃষ্টি করা

সেদিন প্রয়োজন ছিল, সেখানে তারা যত তীব্র ভাষাতেই হোক্ না কেন, শুধুমাত্র সাধারণভাবে দমনপীড়নের নিন্দা করে ইন্দিরা সরকারের আসল চরিত্রটিকেই লোকচক্ষে আড়াল করেছেন। শুধু তাই নয়, যে ইন্দিরা গান্ধী ও তার সরকার এই সমস্ত অপকর্মের নায়ক এবং এহেন বীভৎস ও নারকীয় অত্যাচার চালানোর জন্য যেখানে তাকে ক্রিমিন্যাল চার্জে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত ছিল, সেখানে অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে এই সমস্ত দলের নেতারা তাদের বক্তৃতায় এবং বিবৃতিতে ইন্দিরা গান্ধীকে সমস্ত সমালোচনার বাইরে রেখে তাঁরই ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের জন্য তার কাছে বারবার আবেদন করেছেন এবং এর দ্বারা তারা জনমনে এমন ধারণা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছেন, যেন ইন্দিরা গান্ধী এসবের কিছুই জানতেন না। এমনকি, সি পি আই (এম) নেতা শ্রীসমর মুখার্জী পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর কাছে নানা অত্যাচারের কাহিনী উল্লেখ করার সময় অত্যাচারের উপরোক্ত বিশেষ প্রকৃতি দু'টিকে তুলে না ধরে সাধারণভাবে দমনপীড়নের কথাই বলেছেন এবং তিনিও এ সমস্ত জিনিষ যাতে না ঘটে তার জন্য ইন্দিরাজীকে ব্যক্তিগতভাবে নজর দিতে আবেদন করেছেন, যেন ইন্দিরা গান্ধীর এই সব অপকর্মের ব্যাপারে কোন দায়দায়িত্ব ছিলনা। ইন্দিরা নেতৃত্বের প্রতি চরম মোহগ্রস্ত না হলে এ কাজ কেউ করতে পারেনা।

এই সব দলের নেতারা ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্র দেশের মানুষের কাছ থেকে আড়াল করার জন্যই যে এ কাজ করেছিলেন, তা আর একটি ঘটনা থেকেও একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। বিভিন্ন দলের নেতারা যখন কাঁচড়াপাড়া পরিদর্শনে যান, যাদের মধ্যে সি পি আই (এম) নেতা মহম্মদ ইসমাইলও ছিলেন, তাদের কাছে একটি নিগৃহীতা মেয়ের মা সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে অত্যাচারের চিহ্ন হিসাবে মেয়েটির মাথার একগুচ্ছ ছেঁড়া চুল মহম্মদ ইসমাইলের হাতে দেন এবং প্রস্টিটিউট ও গুণ্ডাদের পরিচয়ও তাদের কাছে জানান। অথচ, এ ঘটনা জানা থাকা সত্ত্বেও নৈহাটি-কাঁচড়াপাড়া স্থানীয় এন সি সি আর এস-এর বৈঠকে একটি ইস্তাহার বের করা নিয়ে আলোচনার সময় গুণ্ডা ও প্রস্টিটিউট দিয়ে মেয়েদের ওপর এহেন বর্বর অত্যাচারের কথা ইস্তাহারে বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রস্তাব দিলে উপস্থিত সি পি আই এবং সি পি আই (এম)-এর দু'জন সদস্যই ইস্তাহারে তা উল্লেখ করতে অস্বীকার করেন এবং বারবার বলা সত্ত্বেও কোনমতেই এ ব্যাপারে রাজী হননা। অত্যাচারের এ জিনিষ বিশেষ করে না বলার অর্থ কি, দেশের মানুষ এবং দুনিয়ার মানুষের কাছে ইন্দিরা সরকারের এহেন স্বৈরাচারী চরিত্রটিকে আড়াল করতেই সাহায্য করা নয়? এ ব্যাপারে

সি পি আই'র কথা না হয় বোঝা যায়, কিন্তু যে সি পি আই (এম) নেতারা ইন্দিরা বিরোধী শ্লোগানে অহরহ বাজার গরম করছেন, তারা ইন্দিরা সরকারের এই বর্বর চরিত্রকে সেদিন দেশের মানুষের কাছে কোন্ বিপ্লবী মহান উদ্দেশ্য সাধন করতে আড়াল করতে চেয়েছিলেন ? তাদের এই সমস্ত আচরণ কি এটাই প্রমাণ করেনা যে, বাইরে ইন্দিরা বিরোধী গরম শ্লোগান দিয়ে কর্মী ও জনসাধারণকে যত বিভ্রান্ত করার চেষ্টাই তারা করুননা কেন, আসলে তারাও ইন্দিরাজীর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন ? না হলে তাদের এভাবে আচরণ করার কি অর্থ থাকতে পারে ?

নেতৃত্বকারী দলগুলির এম পি'রা ও নামকরা নেতারা যা করতে পারতেন

এমনকি, যখন রেল-কর্মীদের পরিবারবর্গের ওপর এহেন পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়েছে, তখন এই সমস্ত দলের পার্লামেন্ট সদস্যরা দিল্লীতে বসে ইন্দিরা তোষণে এবং ফর্মুলা বের করতে সর্বশক্তি নিয়োগ না করে অত্যাচারিত রেল কর্মীদের পরিবারবর্গের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সরকারী অত্যাচারের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারতেন এবং তাদের স্বতস্ফূর্ত বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ আন্দোলন-গুলিকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করতে পারতেন। এম পি'রা ছাড়াও তাদের দলের তেমন নামকরা নেতারা—তাদের সমস্ত নেতাদের কথা আমরা বলছি না—একমাত্র যাদের পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে খানিকটা ইমিউনিটি রয়েছে, অর্থাৎ সহজে যাদের গায়ে সরকার হাত দিতে দশবার ভাববে—যেটা অন্যান্য দলের নেতা বা সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীদের তো নেইই, এমনকি তাদের দলের সকল নেতারও নেই—তারাও এই কাজ করতে পারতেন। স্বভাবতই অনেকে যুক্তি করতে পারেন যে, সরকারী অত্যাচারের প্রকৃতি এবারে যেরূপ তীব্র ছিল, তাতে তাদের দলের এমপি'রা এবং নামকরা নেতারাও এ কাজ করতে গেলে সরকারী আক্রমণের শিকার হতেন। কিন্তু, এম পি'দের এবং তেমন নামকরা নেতা-দের, যাদের পুলিশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি রয়েছে, তাদের ওপর সরকার বা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আক্রমণ চালানো এত সহজ ছিল না। কারণ, একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, সাধারণ কর্মী বা সাধারণ নেতার প্রশ্ন নয়, এইরকম নেতাদের ওপর সরকার আক্রমণ করলে তা নিয়ে পার্লামেন্টে বিরাট হৈ চৈ হওয়ার এবং এসব ঘটনা প্রকাশ হওয়ার মারফত বিদেশে সরকারী ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার ভয় ছিল। আর, তা সত্বেও সরকার তাদের ওপর যদি আক্রমণ চালাত, তাহলে পার্লা-মেন্টারী গণতন্ত্রের সমস্ত ভড়ংটাই দেশের সামনে এবং দুনিয়ার সামনে উদ্‌ঘাটিত

হয়ে যেত। ফলে, এদিক থেকে বিচার করলেও একাজ তাদের করা উচিত ছিল। অথচ, নেতৃত্বকারী এই তিনটি দলের কোন দলেরই এম পি'রা বা সেই সমস্ত নামকরা নেতারা একাজ করেন নি, তাদের মধ্যে পার্লামেন্টে সর্বাধিক সদস্য-বিশিষ্ট পার্টি সি পি আই (এম)ও না। তারা একাজ করেন নি কেন? বিশ লক্ষ রেল কর্মচারীর মা-বোনের ইজ্জত যখন ধূলায় লুণ্ঠিত, দেশের সেই দুঃসময়ে যদি তারা তাদের পাশে এসে না দাঁড়াতে পারেন, তাহলে দেশের মানুষ তাদের এম পি, বা নামকরা নেতা করেছে কিসের জন্য? সে কি শুধু বক্তৃতাবাজী করার জন্য? আর সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ সাধন করার জন্য? অথবা ব্যক্তিগতভাবে সুযোগ সুবিধা ভোগ করার জন্য? গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এম পি এবং নামকরা নেতা এই জন্যই তো তৈরী করা হয়, যাতে এরকম দুঃসময়ে দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তারা তাদের রক্ষা করতে পারেন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য তাদের ইমিউনিটির সুবিধাকে তারা ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের দেশের বুর্জোয়া নেতারাও জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সততা, দায়িত্বজ্ঞান, সাহস ও মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন, এই সব দলের নেতাদের তাও ছিলনা।

তারা তখন এই কাজটি না করে একদিকে কাগজে বিবৃতি দিয়ে দেশের মানুষ এবং রেলকর্মীদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, কত তারা অত্যাচারের মর্মবেদনা অনুভব করছেন, আর অন্যদিকে সরকারের বিশেষ অপকর্মগুলি তাদের প্রবল প্রচারযন্ত্র থাকা সত্ত্বেও লোকচক্ষুর আড়ালে রেখেছেন এবং নিয়ম রক্ষার্থে দু'একটি মিছিল এবং লোকদেখানো কিছু কিছু রেলকলোনী পরিদর্শন করে নিজেদের দায়িত্ব খালাস করেছেন। আর, যে ইন্দিরা সরকার তখন পুলিশ মিলিটারী দিয়ে চরম অত্যাচার চালানো ছাড়াও ভাড়াটে গুণ্ডা ও প্রস্টিটিউট দিয়ে ঘরে ঘরে রেলকর্মীর মা-বোনেদের বেইজ্জত করেছে এবং রেলকর্মীদের গ্রেপ্তার করে 'ফোর্সড লেবার' বা 'স্লেভ লেবার' হিসাবে কাজ করিয়েছে, সেই ইন্দিরা গান্ধীকে এ সবের জন্য অভিযুক্ত না করে তারা তার কাছেই বারবার হস্তক্ষেপের আবেদন করেছেন এবং তলায় তলায় তার সঙ্গেই বোঝাপড়া করে কি করে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা যায়, তার জন্য একটা ফর্মুলা বের করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। এদিক থেকে বিচার করলে এই নেতৃত্বের আচরণ ইউরোপের মডারেট ট্রেড ইউনিয়নিষ্টদেরও লজ্জা দেয়।

নেতৃত্বকারী দলগুলির যে কাজ করা উচিত ছিল

অথচ, যখন দেশের বিশলক্ষ রেলকর্মী এবং তাদের পরিবার মিলে সত্তর লক্ষ

মানুষ সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে যোগাযোগবিহীন এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তখন নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ইন্দিরা তোষণ এবং ফর্মূলা বের করতে সময় নষ্ট না করে যে কাজ করা সবচেয়ে দরকার ছিল, তা হচ্ছে, সেই সংগ্রামী রেলকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মনোবল রক্ষা করা, তাদের যোগাযোগবিহীন বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর সমন্বয় ঘটানো এবং সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের রেলধর্মঘটের প্রতি সমর্থনকে ব্যাপক গণ প্রতিরোধ আন্দোলনে সংগঠিত করে রেলকর্মীদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত করা। বাস্তবে, রেল কর্মীদের সংগ্রামী মনোবল এবারে যে পর্যায়ে ছিল, এমনকি রেলকর্মী পরিবারগুলির মা-বোনেরা পর্যন্ত যে অসমসাহসিকতার সঙ্গে সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় রুখে দাঁড়িয়েছিল, হাজার অসুবিধা অগ্রাহ্য করেও দেশের অগণিত মানুষের রেল ধর্মঘটের প্রতি আগাগোড়া যে অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল, তাতে নেতৃত্ব প্রথমদিকে যে ভুলই করে থাকুন, ধর্মঘট চলার সময়েও যদি সমস্ত দুর্বলতা এবং ইন্দিরা তোষণ নীতি পরিত্যাগ করে সাহসের সাথে, (১) সংগ্রামী রেলকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করতেন এবং তারা যে স্বতস্ফূর্ত বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি গড়ে তুলেছিল, সেগুলোকে যুক্ত করে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রয়োজনীয় সংগঠন গড়ে তোলার দিকে নজর দিতেন,

(২) রেল ধর্মঘটের সমর্থনে শ্রমিক, কৃষক এবং বিশেষ করে ছাত্র, যুব, শিক্ষক, মহিলা প্রভৃতি গণ-সংগঠনগুলিকে যুক্ত করে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কার্যকরী প্রোগ্রাম নিয়ে এগিয়ে আসতেন, এবং

(৩) তাদের এম পি'রা এবং তেমন নামকরা নেতারা, যাদের পুলিশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি রয়েছে, বক্তৃতাবাজীতে সময় নষ্ট না করে রেল-কর্মীদের পাশে থেকে একদিকে তাদের সরকারী অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা, অন্যদিকে তাদের সংগঠিত করে শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করতেন, তাহলে এত বড় এবং এমন বিপুল সম্ভাবনাময় রেলধর্মঘটের এরকম শোচনীয় পরিণতি তো ঘটতই না, বরং তাকে আরও উন্নত রাজনৈতিক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া যেত এবং সরকারী সমস্ত রকমের দুষ্ট পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু, যে এস পি, সি পি আই এবং সি পি আই (এম) ব্যক্তি হিসাবেই হোক্, বা সংগঠন হিসাবেই হোক্ এবারে রেল ধর্মঘটের নেতৃত্বে প্রধান তিনটি স্তম্ভ হিসাবে কাজ করেছে, তারা গণআন্দোলন সম্পর্কে এই নীতি এবং দৃষ্টিভংগীর দ্বারা রেল ধর্মঘট কখনই

পরিচালনা করতে চায়নি। কোন আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রেই এই নীতি এবং দৃষ্টিভংগী এদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। কারণ, এদের মূল রাজনৈতিক লাইনই ভ্রান্ত। এই কথাটা জনসাধারণকে আজ বুঝতেই হবে।

নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত প্রধান তিনটি পার্টির চরিত্র

রেল ধর্মঘটে নেতৃত্বকারী প্রধান তিনটি স্তম্ভের মধ্যে এস পি একটি পরিচিত সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, যেটা কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিরই একটি ভগ্নাংশ। কংগ্রেসের মতই গণতান্ত্রিক সমাজবাদ তাদের সুপরিচিত নীতি এবং তারা সমাজতন্ত্রের কথা বললেও এই রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে সরকারে গিয়ে আইন-কানুন পাল্টে সমাজবাদ আনার নীতি তারা প্রচার করেন। তবে ইন্দিরা গান্ধী গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শ ঘোষণা করে এবং বিশেষ করে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এবং তথাকথিত কিছু কিছু র‍্যাডিকাল শ্লোগান তুলে এদের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রায় সমস্ত অস্ত্রই কেড়ে নেওয়ার পর এদের হাতে বর্তমানে শুধু স্টান্টের রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামগুলোর মধ্যে ভাসাভাসা ভাবে কিছু বিপ্লবী এবং সমাজতন্ত্রের বুলি জুড়ে দিয়ে নেতৃত্ব বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা এবং রাজনীতির দিক থেকে শাসক পার্টির বিরুদ্ধে কিছু ক্যাপিটাল সঞ্চয় করা ছাড়া আর কোন বিষয়বস্তু নেই। ফলে, এস পি এই রেল ধর্মঘটে যে ভূমিকা পালন করেছে, তার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক এবং শ্রেণী-সচেতন রেলকর্মী বা জনসাধারণের এতে আশ্চর্য হওয়ার বিশেষ কিছু নেই।

আর, সি পি আই তো সংশোধনবাদী বর্তমান সোভিয়েট নেতৃত্বের কাছে একদিকে দাসখত লিখে দিয়েছে, অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রগতিশীল (!) ভূমিকা দেখে কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক মোর্চায় আবদ্ধ এবং ক্ষমতাসীন জাতীয় বুর্জোয়াদের হয়ে জাতীয় স্বার্থের ধারক ও বাহক হয়ে বসে আছে। ধর্মঘট চলার অল্প কিছুদিন বাদেই তাদের নেতা ডাঙ্গে তো খোলাখুলিই বলেছেন যে, রেলের মত শিল্পে ধর্মঘট বেশীদিন চলতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, তাতে নাকি 'জাতীয় স্বার্থ' বিপন্ন হয়ে পড়বে। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী ইন্দিরা কংগ্রেসের বক্তব্যের সাথে এর পার্থক্য কোথায়? ফলে, তাদের এই বর্তমান রাজনীতির জন্য তাদের কাছেও শ্রেণী-সচেতন রেল কর্মীদের এবং শ্রমজীবি সাধারণ মানুষের বেশী কিছু আশা করার ছিলনা। তবে, সি পি আই কর্মীদের আমরা ভেবে দেখতে অনুরোধ করব যে, তাদের নেতারা যে বলেন, তাদের বিপ্লব পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে হলেও সেটা একমাত্র করা সম্ভব যদি জনগণের বিপ্লবী

সংগ্রামের ভিত্তি থাকে, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই, অর্থাৎ জনগণের সেই বিপ্লবী সংগ্রামের ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কি তাদের নেতারা রেল ধর্মঘটে তাদের ভূমিকা পালন করেছেন? একথাটা তারা যেন বিচার করে দেখেন।

কিন্তু, যে সি পি আই (এম) নিজেদের বিপ্লবী বলেন, তারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের যে তত্ত্ব প্রচার করেন, সেই বিপ্লব যদি রাষ্ট্র-বিপ্লব হয়, তাহলে তাদের তো গণ আন্দোলনগুলো গড়ে তোলার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, বিভিন্ন দাবীদাওয়া নিয়ে যে গণ আন্দোলনগুলো দেশের অভ্যন্তরে গড়ে উঠছে, সেগুলিকে আরও ব্যাপকতর করা এবং স্তরে স্তরে সেগুলো উন্নত করে গণ আন্দোলন-গুলোকে উন্নত রাজনৈতিক চেতনার স্তরে পৌঁছে দেওয়া। সেই দিক থেকে এবারের এত বড় এবং বিপুল সম্ভাবনাময় রেল ধর্মঘট যে সুযোগ তাদের সামনে এনে দিয়েছিল, তার চাইতে বড় সুযোগ তারা আর কি আশা করতে পারেন? কিন্তু, তারাও কি রেল ধর্মঘটের কোনও স্তরে তাকে সংগঠিত, শক্তিশালী ও ব্যাপকতর করার কোনও কার্যকরী প্রোগ্রাম, এ্যাকশান কমিটি বা নিজেদের পার্টি প্ল্যাটফর্ম, কোনও জায়গা, থেকেই উপস্থিত করেছেন? এবং রেল ধর্মঘটকে উন্নত রাজনৈতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার কোনও চেষ্টা করেছেন? তারা যদি এরূপ কোন কার্যক্রম উপস্থাপিত করতেন, বা করে তা সংগ্রাম কমিটিকে দিয়ে গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হতেন, যেমন আমরা করেছি, তাহলে আজ তারা যে কথা বলছেন তার একটা মানে দাঁড়াত। বরং, আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে কমরেড প্রীতিশ চন্দ বিভিন্ন সময়ে যখনই গণ সংগঠনগুলিকে যুক্ত করে রেল-ধর্মঘটকে ব্যাপকতর করার কোন প্রস্তাব এ্যাকশান কমিটিতে বা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির বৈঠকে দিয়েছেন, তখনই আমাদের কাছে বিস্ময়ের কারণ না হলেও জনসাধারণ শুনলে বিস্মিত হবেন যে, ডাঙ্গের সাথে সুরে সুর মিলিয়ে একই সঙ্গে সি পি আই (এম)-এর পলিট ব্যুরোর সদস্য এবং সিটুর জেনারেল সেক্রেটারী রামমূর্তি সাহেবও প্রতিটি ক্ষেত্রে তার কার্যকরী বিরোধিতা করেছেন, যার জন্য কোন স্তরেই রেল ধর্মঘটকে ব্যাপকতর করার কোন কার্যকরী প্রোগ্রাম এ্যাকশান কমিটিকে বা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে দিয়ে গ্রহণ করানো সম্ভব হয়নি। অথচ, আশ্চর্যের বিষয় রণদিভে সাহেব অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে রেল ধর্মঘটের ব্যর্থতার সমস্ত দায়দায়িত্ব আজ নির্বিবাদে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে বলছেন যে, এন সি সি আর এস নেতৃত্ব নাকি দৃঢ়তা ও বীরত্বের সাথে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছে, যতক্ষণ না আপোষকামী শক্তি তাকে

পরাস্ত করেছে, (The determined and courageous fight put up by the NCCRS leadership till the forces of compromise overwhelmed·····,People's Democracy, June 2,1974)—যেন তারা নিজেরা এই আপোষকামী শক্তি ছিলেন না। অদ্ভুত! মিথ্যাকে অবলীলাক্রমে সত্য বলে চালাবার গোয়েবল্‌সীয় কায়দাটি যে বেশ ভালভাবেই এই দলের নেতারা রপ্ত করেছেন, রণদিভে সাহেব তার প্রমাণ আর একবার দিলেন।

বর্তমান সময়ে সমস্ত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির একটি যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রচেষ্টার কার্যকরী বিরোধিতা করে তারা এস পি'র মত একটি পরিচিত সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সঙ্গে আলাদা করে যেভাবে ঘনিষ্টতা গড়ে তুলছেন, এবং সি পি আই'র সাথে ঘনিষ্টতা গড়ে তুলতে আপ্রান চেষ্টা করে চলেছেন, তাতে তারাও যে একটি আপোষকামী শক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকতে পারে কি? সে যাই হোক্, রণদিভে সাহেব তার এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কতটুকু সততা দেখিয়েছেন, রেল ধর্মঘট চলার সময়ে বিভিন্ন ঘটনা বিচার করেও তা দেখা যাক্।

ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী)'র প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার

প্রসঙ্গতঃ, এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী)'র সারা ভারত সম্পাদক কমরেড প্রীতিশ চন্দ, যিনি এস ইউ সি'র কেন্দ্রীয় কমিটিরও সদস্য, রেলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিভাগীয় ইউনিয়নের তরফ থেকে আলাদা আলাদাভাবে আন্দোলনের পরিবর্তে সমস্ত ইউনিয়নকে একত্রিত করে সর্বসম্মত কর্মসূচীর ভিত্তিতে রেলশ্রমিকদের একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘদিন ধরে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালান। পরে জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ কমরেড প্রীতিশ চন্দের এই উদ্যোগকে গ্রহণ করে এ ব্যাপারে অগ্রণী হন। রেল শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত কারোর কাছেই এ ঘটনা অবিদিত নয়, এবং শেষপর্যন্ত বিভিন্ন ইউনিয়ন এবং সংগঠনগুলিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় ভাবে যে এন সি সি আর এস গঠিত হয়, তাতে কমরেড চন্দের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। তাছাড়া, রেলওয়েমেন্‌স্ ফেডারেশনের ভিতরে এবং বিভিন্ন ক্যাটিগোরি ইউনিয়নের মধ্যে থেকে ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী) রেল-শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে এবং পূর্ব রেল, দঃ পূর্ব রেল, উঃ পূর্ব রেলের মধ্যে ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী)'র খানিকটা কাজ রয়েছে, একথা রেল ধর্মঘটের বর্তমান নেতারাও সকলেই জানেন।

দিল্লীতে রেল-শ্রমিক প্রতিনিধিদের যে কনভেনশনে এন সি সি আর এস গঠিত হয়, সেই কনভেনশনেও কমরেড প্রীতিশ চন্দ ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী)'র পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, যুক্ত-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এন সি সি আর এস-এর 'বডি' যখন গঠিত হয়, তখন ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী)'র কোন প্রতিনিধি সেখানে নেওয়া হয়নি, এবং শোনা যায়, মূলতঃ সিটু এবং এ আই টি ইউ সি'র বিরোধিতার জন্যই নাকি এটা ঘটেছিল। যাই হোক্, রেলকর্মীদের মধ্যে আমাদের যতটুকু সীমাবদ্ধ কাজ আছে, তাকে অস্বীকার করতে না পারার ফলেই শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কমরেড প্রীতিশ চন্দকে এ্যাকশান কমিটির বৈঠকগুলিতে বিশেষ আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেবার জন্য আহ্বান করা হয় এবং তিনি ধর্মঘট চলাকালীন অবস্থায় এ্যাকশান কমিটি এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিটি বৈঠকে উপস্থিত থেকে ধর্মঘট সফল করার জন্য নানা কার্যকরী প্রস্তাব দিয়ে গিয়েছেন, যার মূল দৃষ্টিভংগীর সাথে নেতৃত্বকারী দলগুলির কেউই একমত ছিলেন না এবং যেগুলির অধিকাংশই তাদের বিরোধিতার জন্য কোন স্তরেই গৃহীত হয়নি।

৯ই মে'র বৈঠক

৯ই মে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির বৈঠকে ডাঙ্গে রেলধর্মঘটের সমর্থনে ১৫ই মে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এ্যাকশানের প্রস্তাব দিলে কমরেড প্রীতিশ চন্দ তার পরিবর্তে ভারত বন্‌ধের কার্যক্রম গ্রহণের বিকল্প প্রস্তাব দেন এবং রেলধর্মঘটের ব্যাপারে সরকারী দুরভিসন্ধি সম্পর্কে নেতৃত্বকে সচেতন করে এই আন্দোলনের সাথে ছাত্র, যুব, শিক্ষক, মহিলা, চাষী প্রভৃতি সর্বস্তরের গণসংগঠনগুলিকে যুক্ত করে রেল আন্দোলনকে ব্যাপকতর করার কার্যকরী প্রোগ্রাম গ্রহণের কথা নেতৃত্বকে বার বার বলেন। কমরেড চন্দের ১৫ই মে ভারত বন্‌ধের প্রস্তাবকে ডাঙ্গে এবং রামমূর্তি দুজনে মিলে বিরোধিতা তো করেনই, উপরন্তু জনগণের সমর্থনকে রেলধর্মঘটের পেছনে সংগঠিত করার জন্য কমরেড চন্দের সেদিনের প্রস্তাবকে ডাঙ্গেই শুধু হঠকারী বলে বিরোধিতা করেছিলেন তাই নয়, রামমূর্তি সাহেবও ডাঙ্গের সাথে একই সুরে এই প্রস্তাবের চূড়ান্ত বিরোধিতা করে কমরেড চন্দকে সতর্ক করে বলেছিলেন, রেল আন্দোলনের পরিধি এবং গভীরতাকে বাড়াবেননা ('Don't add dimension to it')। এর মানে হচ্ছে, রেল ধর্মঘট শিল্প বিরোধের পরিধি ছাড়িয়ে যাক্, এটা তারা চাননি। কি অপূর্ব বিপ্লবী দৃষ্টিভংগী! তাহলে

তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেন কেন? এই একটি উক্তির দ্বারাই তো রামমূর্তি সাহেব সি পি আই (এম)-এর গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীটি ব্যক্ত করেছেন। রেলের মত এরূপ একটি বিপুল সম্ভাবনাময় সংগ্রামেরও পরিধি ব্যাপকতর করার এবং তাকে উন্নত রাজনৈতিক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার যত অনুকূল অবস্থাই থাকুকনা কেন, তারা তার বিরুদ্ধে। তাহলে বিপ্লবী বাগাড়ম্বর, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এসব কথা বলে লোক ঠকানোর মানে কি? এতো সেই ধুরন্ধর, বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট বা মডারেট ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীরই নামান্তর। শোধনবাদী ভাঙ্গের সাথে মৌলিক দৃষ্টিভংগীতে এর পার্থক্য কোথায়?

অথচ, সরকার তার বহু আগে থেকেই রেল ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে রেলের আন্দোলনের সাথে যুক্ত নয়, এমন সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদেরও গ্রেপ্তার করে দমননীতির পরিধি ট্রেড ইউনিয়ন স্তর থেকে রাজনৈতিক স্তরে নিয়ে এসেছেন। আর সরকারের বিরুদ্ধে রেলকর্মীদের আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দেবেন, তারা রেল আন্দোলনের পরিধি ব্যাপকতর করতে চাননা। তাদের এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী ১২ই এপ্রিল 'গণশক্তি'তে প্রকাশিত সি পি আই (এম)-এর জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী পি সুন্দরাইয়া কর্তৃক 'দেশব্যাপী গণ-প্রতিবাদ আন্দোলন প্রসঙ্গে' প্রবন্ধেও প্রতিফলিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে, তার দল এবং সি পি আই উভয়েই বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলি কর্তৃক প্রস্তাবিত 'সারা ভারত গণপ্রতিবাদ দিবস'কে রেল ধর্মঘটের সাথে কোনমতেই মেলাতে চাননি। শোনা যায়, ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলির বৈঠকেও শ্রী পি সুন্দরাইয়া 'সারা ভারত গণপ্রতিবাদ দিবস'কে রেল-ধর্মঘটের সাথে কোনমতেই যাতে না মেলানো হয়, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, এর দ্বারা সরকার এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। ফলে, সরকার এরূপ কোন ধারণা নিতে পারে, তেমন জিনিষ করা কখনই উচিত হবেনা। শ্রী রামমূর্তির আচরন তো তাদের উপরোক্ত নীতিরই ফলশ্রুতি মাত্র। তাহলে, রণদিভে সাহেবের আজ এসব কথা বলার উদ্দেশ্য কি? আর, সি পি আই (এম)-এর পলিটব্যুরোর সদস্য এবং সিটুর জেনারেল সেক্রেটারী রামমূর্তি সাহেব স্বয়ং যেখানে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির বৈঠকে 'ডাইমেনশান' না বাড়াবার অজুহাত তুলে ভাঙ্গের সাথে একই সুরে রেল আন্দোলনকে ব্যাপকতর করার প্রস্তাবের চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছেন এবং তার

দ্বারা রেল ধর্মঘটকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন, সেখানে রণদিভে সাহেব নির্বিচারে আজ অন্যের ঘাড়ে সব দায়দায়িত্ব চাপিয়ে বলে দিলেন যে, নেতৃত্বের মধ্যে তারা নাকি আপোষকামী শক্তি ছিলেন না। আশ্চর্য! ভণ্ডামী আর কাকে বলে? তারা বোধহয় দেশের মানুষকে এত বোকা ভেবে বসে আছেন যে, তারা যখন যা বুঝিয়ে দেবেন তাই দেশের মানুষ বুঝবে। এভাবে তারা জনসাধারণ এবং দলের সৎ কর্মীদের আর কতদিন ঠকাবেন?

থ্রি-পয়েন্ট ফর্মূলা

রণদিভে সাহেবদের ভণ্ডামীর এখানেই শেষ নয়। রেল ধর্মঘটের ব্যর্থতার সমস্ত দায়দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপাতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন যে, 'ধর্মঘট চলার পরদিন থেকেই সরকারের সাথে কথাবার্তা চালানো শুরু করা এবং থ্রি-পয়েন্ট ফর্মূলাকে ঘিরে অনাবশ্যক আলোচনা আন্দোলনকে শক্তিশালী করা এবং নেতৃত্বের সাথে জনগণের সরাসরি সংযোগ সাধনের আসল কাজকে বিপথে পরিচালিত করেছে,' (....the negotiations on the morrow of the strike, the useless discussions round the three-point formula all of which not only diverted attention from the main task of strengthening the struggle and linking theleadership directly with the masses.... —People's Democracy, June 2, 1974) —যেন নেতৃত্বের সাথে জনগণের সংযোগ সাধন তারা চেয়েছিলেন এবং সরকারের সাথে কথাবার্তা চালানো এবং থ্রি-পয়েন্ট ফর্মূলা সম্পর্কে তাদের কোন দায়দায়িত্বই ছিল না। যে থ্রি-পয়েন্ট ফর্মূলা নিয়ে অহেতুক আলোচনার জন্য তিনি আজ অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছেন, সেখানেও তাদের ভূমিকা কি ছিল দেখা যাক্। ১০ই মে সকালে ইন্দিরা গান্ধীসহ কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী এ্যাফেয়ারস্ কমিটির কয়েকজন সদস্যের সাথে বিরোধী দলের নেতাদের এক বৈঠকে, (লক্ষ্য করুন) যে বৈঠকে সি পি আই (এম)-এর সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন, থ্রি-পয়েন্ট ফর্মূলার উদ্ভব হয়। এই থ্রি-পয়েন্ট ফর্মূলার মূল বক্তব্য ছিল, একই সাথে (১) নেতাদের মুক্তি, (২) ধর্মঘট প্রত্যাহার, এবং (৩) আলোচনা পুনরারম্ভ করা। ধর্মঘটের পরদিন থেকেই বিরোধী দলের নেতারা কোনমতে ধর্মঘট প্রত্যাহারের ব্যাপারে কতটা ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন, এই থ্রি-পয়েন্ট ফর্মূলা তার একটি জলন্ত প্রমাণ।

কারণ, এই থ্রি-পয়েন্ট ফর্মুলাতে কর্মীদের অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার কথা ছেড়েই দিলাম, শুধুমাত্র নেতাদের মুক্তির কথা ছাড়া, শাস্তি-প্রাপ্ত রেল কর্মীদের প্রশ্ন তো নয়ই, এমন কি রেল আন্দোলনে ধৃত সাধারণ রেলকর্মীদের বা সাধারণ নেতাদের মুক্তির কথাটিও তারা উত্থাপন করেননি।

এবার লক্ষ্য করুন, সেদিনই বেলা ৩টায় এন সি সি আর এস-এর এ্যাকশান কমিটির বৈঠকে এই থ্রি-পয়েন্ট ফর্মুলাটি রিপোর্ট আকারে যিনি উপস্থিত করেছিলেন, তিনি অন্য কেউ নন, সি পি আই (এম) নেতা শ্রী সমর মুখার্জী। আরও লক্ষ্য করুন, রিপোর্টটি পেশ করে তিনি একথাও বলেন যে, সকালের বৈঠক শেষে শ্রীমতি গান্ধী যখন উঠে যাচ্ছিলেন, তখন তিনিই এই থ্রি-পয়েন্ট ফর্মুলা সম্পর্কে শ্রীমতি গান্ধীর প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলেন, যার উত্তরে শ্রীমতি গান্ধী তার সহযোগীদের সাথে তাকে আলোচনা চালিয়ে যেতে বলেছিলেন। রণদিভে সাহেব বলবেন কি, এত সব নেতারা থাকতে—(১) কেন এ্যাকশান কমিটির বৈঠকে শ্রী সমর মুখার্জিই থ্রি-পয়েন্ট ফর্মুলাটি পেশ করলেন? এবং, (২) এই থ্রি-পয়েন্ট ফর্মুলার ওপর শ্রীমতি গান্ধীর প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য আর কেউ নয়, তিনিই কেন এত ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন? এর দ্বারা কি এটাই প্রমাণ হয় না যে, এই থ্রি-পয়েন্ট ফর্মুলা সম্পর্কে তাদের আপত্তি দূরের কথা, বরং অত্যধিক আগ্রহ ছিল? আবার দেখুন। থ্রি-পয়েন্ট ফর্মুলা অফিসিয়ালি এ্যাকশান কমিটির কাছে না আসার কারণে তার ওপর কোন আলোচনাই হতে পারে না বলে ১০ই মে এ্যাকশান কমিটি থ্রি-পয়েন্ট ফর্মুলা প্রত্যাখ্যান করে, এবং সরকারের পক্ষ থেকেও সেদিনই বিকালে থ্রি-পয়েন্ট ফর্মুলার সমস্ত ঘটনাই অস্বীকার করা হয়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও পরদিন ১১ই মে বিরোধী দলের এম পি'রা থ্রি-পয়েন্ট ফর্মুলা সম্পর্কিত প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য লিখিতভাবে সই করে অফিসিয়েলি এ্যাকশান কমিটির কাছে পাঠান, যে প্রস্তাবে সি পি আই (এম)এর এম পিরাও সই করে ছিলেন। এর পরেও কি রণদিভে সাহেব বলবেন যে, থ্রি-পয়েন্ট ফর্মুলা সম্পর্কে তাদের কোন দায়দায়িত্ব ছিল না?

১২ই মে এ্যাকশান কমিটির বৈঠকে কমরেড প্রীতিশ চন্দ এই থ্রি-পয়েন্ট ফর্মুলার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং থ্রি-পয়েন্ট ফর্মুলার মধ্য দিয়ে নেতাদের দুর্বলতা যেভাবে প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রস্তাব দেন: (১) এ্যাকশান কমিটিকে নিজের অবস্থানে সুদৃঢ় থাকতে হবে এবং সম্মানজনক মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যেতে হবে ও একই সাথে সরকারের

সাথে আলাপ-আলোচনাও চালাতে হবে। (২) ধর্মঘট চালাবার সাথে সাথে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে রেল ধর্মঘটে ধৃত (শুধু নেতারা নয়) সমস্ত নেতা ও কর্মীদের মুক্তি এবং অর্থ নৈতিক দাবীগুলির ওপর সরকারের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে, (৩) রেল ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ডি আই আর, মিসা, আই পি সি অথবা সি আর পি সিতে ধৃত হাজার হাজার রেল শ্রমিক, অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে (৪) মিথ্যা নাশকতা-মূলক অভিযোগের ধারা তুলে কর্তৃপক্ষ যাদের শাস্তিপ্রদান করে, তাদের বিষয় বাদ দেওয়া চলবে না। কমরেড প্রীতিশ চন্দ এ্যাকশান কমিটিতে সুনির্দিষ্ট-ভাবে এই প্রস্তাব উথাপন করে সরকারকে তা গ্রহণে বাধ্য করার জন্য নেতৃত্বকে ইন্দিরা গান্ধী ও তার সরকারের সাথে 'হবনব' করার ওপর নির্ভর না করে রেল-ধর্মঘটের সমর্থনে ব্যাপকতর গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের ওপর পুনরায় বারবার গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু, তার সেই প্রস্তাবে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত এই তিনটি দলের কেউই সেদিন গুরুত্ব দেয়নি। তারপরেও রণদিভে সাহেব যদি এই সমস্ত কথা বলেন, তাহলে তাদের আর কি বলা যেতে পারে!

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট আহ্বান এবং নিঃসর্ত প্রত্যাহার

এই ১২ই মে তারিখেই আবার সি পি আই (এম) নেতারা ১০ই মে থেকে কারোর সাথে আলোচনা না করেই একতরফা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের যে লাগাতার ধর্মঘট আহ্বান করেছিলেন, তা হঠাৎ নিঃসর্তভাবে প্রত্যাহার করে নেন। এখানে মনে রাখবেন, ১০ই মে যেদিন থেকে তারা এই লাগাতার ধর্মঘট ডাকেন সেদিন ছিল শুক্রবার, ১১ই মে মাসের দ্বিতীয় শনিবার হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারী অফিস এমনিই বন্ধ ছিল, আর ১২ই মে রবিবার হলেও সেদিনই এই লাগাতার ধর্মঘট তারা তুলে নেন, যাতে ১৩ই মে সোমবার সকাল থেকেই কর্মীরা কাজে যোগ দেয়। লাগাতার ধর্মঘটের কি বিপ্লবী কর্মসূচী! আরও লক্ষণীয় হচ্ছে, সি পি আই(এম) নেতারা এই লাগাতার ধর্মঘট হঠাৎ নিঃসর্তভাবে তুলে নেওয়ার ব্যাপারে যে অপূর্ব কৈফিয়তটি সেদিন উপস্থিত করেছিলেন, তা হচ্ছে, তারা নাকি ইন্দিরা সরকারের মধ্যে কর্মচারীদের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে আলোচনায় মীমাংসার ইচ্ছা দেখতে পেয়েছিলেন। অদ্ভুত! যে সময়ে বিশলক্ষ রেলশ্রমিক-কর্মচারী ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত এবং যে সময়ে ইন্দিরা সরকার রেলধর্মঘটের ক্ষেত্রে আলোচনায়

মীমাংসার কোন মনোভাব দেখানো তো দূরের কথা, বরং চূড়ান্ত স্বৈরাচারী কায়দায় তা ভাঙ্‌বার জন্য এমন বর্বর দমনপীড়নের রাস্তা গ্রহণ করেছে যে, সাধারণ মানুষ পর্যন্ত ইন্দিরা সরকারের ওপর ক্ষিপ্ত, ঠিক সেই সময়ে মহাবিপ্লবী (!) সি পি আই (এম) দলের নেতারা সেই ইন্দিরা সরকারের মধ্যেই নাকি কর্মচারীদের সাথে বিরোধের ক্ষেত্রে আপোষে মীমাংসার মনোভাব দেখতে পেলেন। ইন্দিরা সরকারের নির্লজ্জ চাটুকাররাও সেই সময়ে তাদের এরকম একটি সার্টিফিকেট দিতে পারত কিনা সন্দেহ। সেদিন সি পি আই (এম) নেতাদের উপরোক্ত আচরণ ইন্দিরা সরকারের বর্বরোচিত চরিত্রকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আড়াল করতেই শুধু সাহায্য করেছে তাই নয়, চূড়ান্ত দমনপীড়নের দ্বারা রেলধর্মঘট ভাঙ্‌বার ক্ষেত্রেও ইন্দিরা গান্ধী ও তার সরকারের হাতকে শক্তিশালী করেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই সি পি আই (এম) নেতাদের এই আচরণ সেই সময়ে রেলশ্রমিকদের মধ্যে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

১৬ই মে'র বৈঠক

১৬ই মে কেন্দ্রীয় টি ইউ গুলির বৈঠকে এবং সংগ্রাম কমিটির বৈঠকে কমরেড প্রীতিশ চন্দ পুনরায় প্রধান মন্ত্রীর কাছে আবেদন নিবেদনের রাস্তা পরিত্যাগ করে সমস্ত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র, যুব, মহিলা সংগঠনগুলিকে যুক্ত করে রেল ধর্মঘটের সমর্থনে দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করার প্রস্তাব দেন। সি পি আই (এম) নেতারা সহ সকলে মিলে তা তো প্রত্যাখ্যান করেনই, এমনকি শুনলে যে কেউ আশ্চর্য হবেন যে, কমরেড প্রীতিশ চন্দ এই বৈঠকে অন্যান্য স্তরের জনসাধারণের সাথে দিল্লীর আশেপাশে অবস্থিত ধর্মঘটী রেল শ্রমিকদের জড় করে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থানের যে কর্মসূচীটি দিয়েছিলেন, সেই প্রস্তাবকেও অন্যান্যদের সাথে সি পি আই (এম) বন্ধুরা সমানভাবেই বিরোধিতা করেছিলেন, যার জন্য তাও সংগ্রাম কমিটিকে দিয়ে বা কেন্দ্রীয় টি ইউ গুলিকে দিয়ে গ্রহণ করানো সম্ভব হয় নি! জনগণের সাথে নেতৃত্বের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে রণদিভে সাহেবরা সেদিন কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাই না করেছিলেন! আর, সি পি আই'র ভূপেশ গুপ্ত তো কমরেড প্রীতিশ চন্দের এই প্রস্তাবের উত্তরে সেদিন পরিষ্কার-ভাবেই বলেন যে, তারা শুধুমাত্র রেলকর্মী ও সরকারের মধ্যে 'হাইফেন', মানে সেতুর কাজ করতে পারেন, আর কিছু নয়। অথচ, দিল্লী একটি বড় রেলওয়ে

ঘাঁটি হিসাবে দিল্লীর আশেপাশে যে হাজার হাজার রেল শ্রমিক ছিল এবং কোন কর্মসূচীর অভাবে পরিকল্পনাহীন অবস্থায় যারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এই প্রোগ্রামের দ্বারা সহজেই তাদের জড় করে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে বিক্ষোভ ও অবস্থানের কার্যক্রমটি রূপায়িত করা যেত। যাই হোক্, এই প্রস্তাবটিকেও যখন নেতারা সকলে মিলে প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন আমরা অনেক চেষ্টা করে এই নেতৃত্বকে দিয়ে অন্ততঃ ২১শে মে এক দিনের জন্য 'দমননীতি বিরোধী দিবস' হিসাবে পালনের কার্যক্রমটি গ্রহণ করাতে সক্ষম হই। এই কার্যক্রমটি যদিও তেমন কিছু ছিলনা, এবং মুখ রক্ষা করতে হবে বলেই এটা তারা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এইটুকু কার্যক্রমও রূপায়িত করার জন্য তারা ব্যাপক প্রস্তুতির কোন চেষ্টাই করেননি।

১৭ই মে'র একটি ঘটনা

তাছাড়া, ১৭ই মে'র আর একটি ঘটনা আন্দোলন সম্পর্কে বিরোধী দলগুলির দুর্বলতাকে, যার মধ্যে সি পি আই (এম) নেতারাও ছিলেন, একেবারে নগ্নভাবে প্রকাশ করে দেয়। ১৬ই মে'র এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেতারা ঐদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অন্ততঃ একবার সাক্ষাত করার জন্য বারবার চেষ্টা করলেও ইন্দিরাজী শুধু দেখা করতে অস্বীকার করেন তাই নয়, বিরোধী দলের নেতাদের সাথে অত্যন্ত অপমানকর আচরণ করেন। ঘটনাটি ঘটেছিল এইরূপ যে, প্রথমদিকে বিরোধী দলের নেতারা কয়েকবার চেষ্টা করলেও প্রধানমন্ত্রীর অফিস এই সাক্ষাতের ব্যাপারে কোন সাড়াই দেয়নি। অবশেষে নেতারা হন্যে হয়ে বহু চেষ্টা করার পর ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশ অনুযায়ী তার অফিস নেতাদের কাছে এই সাক্ষাতের কারণ জানতে চায়। নেতারা যখন তা ব্যক্ত করেন, তখন ইন্দিরা গান্ধী নেতাদের শুধু এইটুকু জানিয়ে দিতে তার অফিসকে নির্দেশ দেন যে, ধর্মঘট প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কোন আলোচনাই হবে না। এই ঘটনাটি নিয়ে সরকারী দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে বিরোধী দলের নেতারা একটি বিবৃতি দেন। সেই বিবৃতিতে ইন্দিরা গান্ধীর এই ডিক্‌টেটোরিয়াল মনোভাবকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করার জন্য কমরেড প্রীতিশ চন্দ বারবার বলা সত্ত্বেও নেতারা কিন্তু এ ব্যাপারে 'অযৌ' এই শব্দটি ছাড়া একটি কঠোর শব্দ পর্যন্ত তাতে ব্যবহার করতে রাজী হননা। আর মহাবিপ্লবী (!) সি পি আই (এম) দলের নেতা শ্রী সমর মুখার্জী কমরেড প্রীতিশ চন্দের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে শুধু বলেছিলেন, কঠোর শব্দ

ব্যবহার করে কি দরকার! যেন শ্রী সমর মুখার্জিরা কখনও কারোর বিরুদ্ধে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন না। আমরা তো জানি সুযোগ পেলেই অপরের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্‌গার, মিথ্যা কুৎসা এবং অশালীন বক্তব্য বলতে তাদের দলের নেতাদের এতটুকু আটকায়না। তাহলে ইন্দিরাজীর চূড়ান্ত ডিক্‌টেটোরিয়াল আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর বাক্য প্রয়োগে তাদের এবম্বিধ আপত্তির কি কারণ ছিল? রণদিভে সাহেব অনুগ্রহ করে দেশের মানুষকে তা জানাবেন কি?

২৪শে মে'র বৈঠক

রেল ধর্মঘটের ব্যাপারে ২৪শে মে আবার কেন্দ্রীয় টি ইউ গুলির বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে কমরেড প্রীতিশ চন্দ রেল ধর্মঘটের সমর্থনে উচ্চতর সংগ্রাম গড়ে তোলার শেষ চেষ্টা হিসাবে বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প, ইস্পাত শিল্প এবং কয়লা শিল্পের শ্রমিকদের রেল আন্দোলনের সাথে যুক্ত করার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন। ডাঙ্গে চূড়ান্তভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে যারা বিপ্লব করতে চায়, একমাত্র তারাই এ প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারে, তারা পারেন না। সি পি আই (এম)-এর রা ম মূ র্তি সাহেব সেই বৈঠকে কমরেড চন্দের প্রস্তাবের একটি বিকল্প প্রস্তাব দেন, যেটা নিয়ে কাগজেপত্রে পরে খুব হৈ চৈ হয় এবং যার বিরুদ্ধেও ডাঙ্গে সংবাদপত্রে রামমূর্তিকে আক্রমণ করেন। শ্রী রামমূর্তির সেই মহাবিপ্লবী (!) কার্যক্রমটি ছিল এইরকম যে, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা রেল ধর্মঘটের পক্ষে সংহতি প্রকাশের জন্য তাদের টিফিনের সময় শ্লোগান দিতে পারেন। রেল কর্মচারীরা বিচার করে দেখবেন, কমরেড চন্দের প্রস্তাবের বিকল্প হিসাবে কি 'বিপ্লবী' প্রোগ্রামই সেদিন সি পি আই (এম) নেতারা তাদের সংগ্রামের সমর্থনে উপস্থিত করেছিলেন! আরও আশ্চর্যের বিষয়, কমরেড প্রীতিশ চন্দের উপরোক্ত প্রস্তাবের অনুক্রমে পশ্চিম বাংলা ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণীর) সম্পাদক কমরেড ফটিক ঘোষ রেল ধর্মঘটের সমর্থনে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলবার জন্য সিটু সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও গণসংগঠনকে যে লিখিত প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সিটু এখন পর্যন্ত সেই চিঠির জবাব দেওয়ারই সময় করে উঠতে পারেনি। আশ্চর্য! রণদিভে সাহেবরা তারপরেও আজ এই সব কথা বলছেন!

এদিকে ১৭ই মে'র পর থেকে সি পি আই (এম) সহ পার্লামেন্টের সমস্ত বিরোধী দলের নেতারাই ভিতরে ভিতরে ধর্মঘট প্রত্যাহারের ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে ব্যগ্র হয়ে পড়েন এবং তার জন্য যে কোন উপায়ে একটা ফর্মূলা বের করতে তারা

হন্যে হয়ে চেষ্টা করতে থাকেন এবং এই উদ্দেশ্যে কখনও খাদিলকারের সাথে, কখনও কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির সদস্যদের সাথে এবং কংগ্রেসের নানা স্তরের নেতাদের সাথে তারা দেখা করে যাচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে সি পি আই (এম) নেতাদের আগ্রহ সেদিন কতটা ছিল, তার একটি প্রতিচ্ছবি 'লিংক' কাগজেও পাওয়া যায়। 'লিংক' এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছে, রেলধর্মঘট প্রত্যাহারের ব্যাপারে সি পি এম নেতা পি রামমূর্তির কর্মসূচী ফিরি করার ভূমিকা সেদিন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের কাছে নাকি অত্যন্ত রহস্যজনক মনে হয়েছিল, ... the hawkish stand of CP-Mleader P. Rammurthy onthe withdrawal of the railwaymen's strike has become an enigma for political observers.....Link, June 2, 1974)। যদিও 'লিংক'-এর এসব কথা বলার পিছনে মতলব আলাদা, তাহলেও এই রিপোর্টের মধ্য দিয়ে যে সত্যটি বেরিয়ে এসেছে, তা লক্ষ্য করার বিষয়।

অথচ, রেল ধর্মঘটকে শক্তিশালী করার জন্য যে কাজগুলি তাদের নেতা ও এম পি-দের সে সময়ে করা একান্ত কর্তব্য ছিল, যেগুলো আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, সে ব্যাপারে তারা কোন উৎসাহ বা উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। নেতাদের পক্ষ থেকে আগাগোড়া আলোচনার এই মাত্রাতিরিক্ত ব্যগ্রতা এবং নেতাদের আচরণের মধ্য দিয়ে যে অবিশ্বাস্য রকম দুর্বলতা প্রতিটি স্তরে সেদিন প্রকট হয়ে বেরিয়ে এসেছিল, ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক রেল ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ক্রমাগত তথাকথিত 'দৃঢ়' (firm) মনোভাব গ্রহণ করতে তা কার্যকরীভাবে সাহায্য করেছে। তিনি বুঝেই ফেলেছিলেন যে, তিনি যত দৃঢ় হতে থাকবেন, এইসব নেতারা তত লেজে-গোবরে করতে থাকবেন। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। এই সব নেতারা শেষের দিকে ধরেই নিয়েছিলেন যে, ধর্মঘটের পরিণাম তো যা হবার হবেই, তবে নিজের থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়ে কেউ তার দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চাননি, বরং তারা সকলেই ধর্মঘট প্রত্যাহারের কথা কে আগে বলে তার জন্য অপেক্ষা করেছেন, যাতে অপরে কেউ প্রস্তাব দিলে তার ঘাড়ে দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তারা বাজীমাৎ করতে পারেন।

ঠিক সেই সময়ে এসেই ডাঙ্গে সাহেবরা জাতীয় স্বার্থের ধারক ও বাহক হিসাবে তাদের দায়দায়িত্ববোধ আর চেপে রাখতে পারলেন না। ভূপেশ গুপ্ত'র নিজের উক্তিতেই, রেলকর্মী ও সরকারের মধ্যে তারা এতদিন যে হাইফেনের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং তার দ্বারা রেল ধর্মঘটের চূড়ান্ত ক্ষতি সাধন করেছেন, ২৫শে মে জোনাল ও গোষ্ঠী ভিত্তিতে রেলকর্মীদের সিদ্ধান্ত

গ্রহণের প্রস্তাবের দ্বারা সেই রেলশ্রমিক আন্দোলনে ফুলষ্টপ টেনে দেবার কাজটি তারা সমাধা করলেন। পরদিন ২৬মে এস পি'র গোরেও ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রস্তাবকেই একমাত্র যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত বলে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলেন। এই অবস্থায় সি পি আই (এম) নেতারা, যারা অন্যদের মত একইভাবে ধর্মঘটকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিতে আগাগোড়া কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং শেষের দিকে অন্যদের মতই মনে প্রাণে ধর্মঘট প্রত্যাহারের কামনা করেছেন, যেটা তাদের আচরণ থেকেও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, তারা সি পি আই'র উপরোক্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সমস্ত দায়দায়িত্ব চাপিয়ে নিজেদের সমস্ত অপকর্ম আড়াল করবার এবং বিপ্লবী সাজবার একটা সুযোগ খুঁজে পায়, এবং যাকে মূলধন করেই আজ তারা বাজার গরম করার চেষ্টা করছেন।

সি পি আই (এম) কর্মীদের ষ্ট্রাইক ভেঙ্গে কাজে যোগদান

অথচ, এই মহাবিপ্লবী (!) সি পি আই (এম) দলের কর্মীরা এবং তাদের প্রভাবিত ইউনিয়নের সদস্যরা ২৬ই মে থেকেই বিভিন্ন জায়গায়, ষ্ট্রাইক ভেঙ্গে কাজে যোগ দিতে সুরু করে এবং তার দ্বারা সি পি আই প্রদত্ত উপরোক্ত প্রস্তাবের বহু আগেই ধর্মঘট প্রত্যাহারের বাস্তব অবস্থা নিজেরাই সৃষ্টি করে। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গার খবরে জানা যায় যে, সি পি আই (এম) নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ রেলের সি এম নাম্বিয়ার পরিচালিত ইউনিয়ন, আসামের পাণ্ডু, লামডিং, বনগাইগাঁও এবং পঃ বাংলার বর্ধমান, আসানসোল, আদ্রা প্রভৃতি জায়গায় তাদের কর্মীরা এবং ইউনিয়নের সদস্যরা ১৬ই মে থেকেই কাজে যোগ দিতে আরম্ভ করে। কলকাতায় গার্ডেনরীচে সি পি আই(এম) কর্মী সমর্থকদের একটা অংশ ধর্মঘট প্রত্যাহারের বহু আগেই কাজে যোগ দেয়। সি পি আই (এম)-এর লোকো রানিং ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের সারা ভারত সম্পাদক এবং এন সি সি আর এস-এর এ্যাকশান কমিটির সদস্য, নামকরা সি পি আই(এম) নেতা এস কে ধরের উপস্থিতিতেই তাদের ইউনিয়নের আশীজন ড্রাইভার আদ্রা ডিভিসানের আনাড়াতে ষ্ট্রাইক ভেঙ্গে কাজে যোগ দিয়েছে এবং পূর্ব রেল এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলে সি পি আই (এম) পরিচালিত এই লোকো রানিং ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের বেশীর ভাগ সদস্যই ধর্মঘট প্রত্যাহারের বহু আগে থেকেই প্রায় সর্বত্র কাজে যোগ দিতে সুরু করে। শুনলে যে কেউ আশ্চর্য হবেন যে, এ ব্যাপারে কোথাও কোথাও রেলকর্মীদের ধরে ধরে 'ফোর্সড লেবার' হিসাবে কাজ করানোর সরকারী চক্রান্তটিকেও তারা নিজেদের এই হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কাজে

লাগিয়েছেন। যেখানে ধর্মঘটের পক্ষে চূড়ান্ত মনোবল দেখে তাদের প্রভাবিত সাধারণ কর্মীদের কাজে যোগ দিতে তারা সরাসরি বলতে পারেন নি, সেখানে তাদের মাইনে তুলতে যাবার জন্য তারা প্ররোচিত করেছেন এইটে জেনেই যে, মাইনে তুলতে গেলেই তারা ধরা পড়বে এবং সরকার ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের কাজ করালে তারা সহজেই তার সপক্ষে একটা অজুহাত সৃষ্টি করতে পারবেন। এটা সম্ভবতঃ তারা তাদের কর্মীদের যা চিরকাল বুঝিয়ে থাকেন, সেই 'ক্যাডার সেভিং'-এর কৌশল হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। আশ্চর্য! এইদিক থেকে বিচার করলে এবারের ধর্মঘটে সি পি আই(এম) নেতাদের ধূর্তামি এবং চালাকি যে সকলকেই অতিক্রম করেছে, এ বিষয়ে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এখন শুধু ভাঙ্গের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেই কি তাদের এই ধূর্তামি এবং চালাকিতে কোন শ্রেণী-সচেতন রাজনৈতিক কর্মী পা দেবেন?

২৭শে মে'র বৈঠক

২৭শে মে'র বৈঠকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারেও তাদের বিরোধিতা ছিল বলে যে প্রচার তারা চালাচ্ছেন, তাও কতটা সত্য এবারে তা দেখা যাক্। প্রথমতঃ, লক্ষ্য করুন, ২৬শে মে ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়ে ফার্ণাণ্ডেজ সহ এ্যাকশান কমিটির যে কয়জন সদস্য জেলের ভিতর থেকে চিঠি পাঠান, সি পি আই (এম)-এর লোকো রানিং স্টাফ এ্যাসোসিয়েসনের নেতা শ্রী চৌধুরীও তার মধ্যে ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, লক্ষ্য করার বিষয় ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রস্তাব সম্পর্কিত সেই চিঠিটি ২৭শে মে এ্যাকশান কমিটির বৈঠকে যিনি প্রথম পড়ে শোনান, তিনি অন্য কেউ নন, সি পি আই (এম) নেতা শ্রী সমর মুখার্জী। তৃতীয়তঃ, আরও লক্ষ্য করার বিষয়, চিঠিটি পড়া শেষ করেই শ্রী সমর মুখার্জী যা বলেছিলেন, তা হচ্ছে, চিঠিটি প্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া হোক্ এবং ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক্ ("Send it to the press and let it be called off".)।

শ্রী সমর মুখার্জীর উপরোক্ত উক্তির পর কমরেড প্রীতিশ চন্দ ও শ্রী প্রিয় গুপ্ত জেল থেকে প্রেরিত চিঠির ওপর ভিত্তি করে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত যদি একান্তই গ্রহণ করা হয়, তাহলে উপস্থিত প্রতিটি সদস্যের এই ব্যাপারে মতামত রেকর্ড করার জন্য চাপ দেন এবং ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী)'র পক্ষ থেকে কমরেড প্রীতিশ চন্দ ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবে তার অমত রেকর্ড করান এবং প্রিয় গুপ্তও তার অমত জানান। শ্রী সমর মুখার্জীকে

এ ব্যাপারে মতামত দিতে বলা হলে তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে (লক্ষ্য করুন, 'ব্যক্তিগতভাবে') এ ব্যাপারে তার দ্বিমত আছে। কিন্তু, তার সাথে আবার একথাও তিনি জুড়ে দেন যে, ধর্মঘট প্রত্যাহার করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই ("Personally I disagree. But there is no other alternative but to withdraw the strike.")। এমনকি, কমরেড প্রীতিশ চন্দ তার ব্যক্তিগত মতামতের পরিবর্তে তাদের সংগঠনের মতামত দেওয়ার জন্য তাকে নির্দিষ্ট করে বললেও তিনি সেই একই বক্তব্যের পুনরুক্তি করেন। এমনকি, খবরে জানা যায় যে, সেই বৈঠকে আলোচনার একটা পর্যায়ে শ্রী প্রিয় গুপ্ত সরাসরি শ্রী সমর মুখার্জীকে যখন বলেন যে, সিট্যু যদি রাজী থাকে, তাহলে ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রস্তাব জেল থেকে পাঠানো সত্ত্বেও তারা রেল ধর্মঘট চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, শ্রী সমর মুখার্জী সে ব্যাপারেও তাকে সম্মতিসূচক কোন কথা বলেননি। তাদের এ সকল আচরণের পরেও কি প্রমাণ হতে বাকী থাকে যে, তারা ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কিরকম বিরোধী ছিলেন ?

আসলে, রেল ধর্মঘট পরিচালনার কোন স্তরেই সি পি আই'র সাথে মৌলিক দৃষ্টিভংগীতে সি পি আই (এম)-এর কোন পার্থক্য ছিল না। শুধু সি পি আই সোভিয়েটের নির্দেশে চলে বলে এবং কংগ্রেসের সাথে রাজনৈতিক মোর্চায় আছে বলে এবং এই দুটোর চাপ তাদের ওপর সরাসরি কাজ করে বলে তারা যেভাবে আচরণ করতে বাধ্য হয়েছে, সি পি আই (এম) ভিতরে ভিতরে সোভিয়েটের সঙ্গে এবং ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বোঝাপড়া গড়ে তোলবার চেষ্টায় অনেকটা এগিয়ে গেলেও আজও তা পাকাপাকি রূপ না নেবার জন্য তাদের আচরণের ক্ষেত্রে ঠিক ততটুকু পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয়েছে। এর বেশী কিছু নয়।

যাই হোক্, এখন বিচার্য বিষয় হচ্ছে, ধর্মঘট প্রত্যাহারের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তারা তাদের সংগঠনের মতামত রেকর্ড না করিয়ে সেদিন সমর বাবুর ব্যক্তিগত মতামত রেকর্ড করানোর কৌশল গ্রহণ করেছিলেন কেন ? ২৬শে মে প্রেরিত ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রস্তাব সম্পর্কিত চিঠিটর বিষয়বস্তু তারা ২৭শে মে'র বৈঠকের আগেই জেনেছিলেন। ফলে, সংগঠনগত ভাবে তারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি, এমন অবস্থা তাদের ছিল না। তাহলে, সংগঠনগত সিদ্ধান্ত তারা রেকর্ড করাননি কেন ? কারণ, এর দ্বারা একই সাথে তারা সেদিন দুটি রাস্তা খোলা রেখেছিলেন। প্রথমতঃ, এইটুকু বক্তব্যের দ্বারাও যদি

তারা সরকারের কাছে বেকায়দায় পড়েন, তাহলে তারা সহজেই সরকারকে বোঝাতে পারবেন যে, এ ব্যাপারে তাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে দ্বিমত প্রকাশ করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মঘট প্রত্যাহারের ব্যাপারে তারা একমত থাকা সত্ত্বেও অন্যেরা, বিশেষ করে এ আই টি ইউ সি'র ভূমিকা যখন প্রকাশ্যেই এসে গিয়েছে এবং এটাও তারা বুঝে ফেলেছেন যে, এই ধর্মঘট চলার আর কোন সম্ভাবনা নেই, তখন এই ব্যাপারে চালাকি করে দ্বিমত প্রকাশ করে রেলকর্মী, জনসাধারণ এবং নিজেদের র‍্যাংকেও বিভ্রান্ত করার এই সুযোগটি সৃষ্টি করে রাখলেন, যেন তারা নিজেরা ধর্মঘট প্রত্যাহার চান নি। তা না হলে এইভাবে তাদের আচরণ করার কি অর্থ থাকতে পারে ?

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিশ্বস্ত অনুচর

অথচ, সরকারী চরম দমনপীড়ন এবং নেতৃত্বের চূড়ান্ত দুর্বল ও আপোষমুখী আচরণের ফলে বিশ লক্ষ রেলকর্মীকে জড়িত করে দেশব্যাপী এতবড় ধর্মঘট শেষের দিকে বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও সামান্য দুর্বলতা দেখা দিলেও সামগ্রিকভাবে রেলকর্মীদের মনোবল ধর্মঘটের শেষ মুহূর্তেও যে রকম অটুট ছিল, এবং দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের রেল ধর্মঘটের প্রতি যে অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল, তাতে নেতৃত্ব সাততাড়াতাড়ি ধর্মঘট প্রত্যাহারে ব্যগ্র না হয়ে জনসমর্থন এবং রেল কর্মীদের সংগ্রামী চেতনার ওপর আস্থা রেখে যদি আর কিছুদিন ধর্মঘট চালিয়ে যেতেন, তাহলে তখনও সরকারী অনমনীয় মনোভাবের উপযুক্ত জবাব দেওয়া সম্ভব হত। ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হবার সংবাদ রেডিও এবং কাগজে প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও বহু জায়গায় রেলকর্মীরা তারপরেও দু-একদিন বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মঘট চালিয়ে গিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, তারা তখনও লড়াই চালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন। আর, অন্যদিকে ইন্দিরা সরকার বাইরে যতই অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করুক না কেন, ভেতরে ভেতরে অবস্থা তাদের পক্ষেও তখন চূড়ান্ত খারাপের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। কারণ, প্রথমদিকে ইন্দিরা গান্ধী যেটা আশা করেছিলেন এবং দেশের ভিতরে শিল্পপতি ও একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীদের আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে, সাত-আট দিনের মধ্যেই রেল ধর্মঘট তিনি ভেঙ্গে দিতে পারবেন এবং সেরকমভাবেই, বড় জোর তার দু'এক দিনের বেশী, প্রস্তুতি নিয়ে রেল ধর্মঘট মোকাবিলা করার জন্য তিনি এগিয়েছিলেন, সরকারী এত অত্যাচার এবং নেতৃত্বের এত ত্রুটি এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও রেল-কর্মীদের বিস্ময়কর সংগ্রামী মনোবলের জন্য দীর্ঘদিন পার হওয়ার পরও তাঁর সে

আকাঙ্খা সফল হয়নি। ফলে, গোড়ার দিকে শিল্পপতি ও একচেটিয়া পুঁজিপতিরা রেল ধর্মঘটে সরকারী আচরণের যতই তারিফ করুকনা কেন, দীর্ঘদিন পার হয়ে যাবার পরেও রেল ধর্মঘট ভাঙবার কোন লক্ষণই যখন দেখা গেলনা এবং স্বাভাবিক ভাবেই শিল্পে এবং অর্থনীতিতে তার চাপ প্রকট হয়ে দেখা দিতে সুরু করল, তখন সেই সমস্ত শিল্পপতি এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই আতংকিত হয়ে গিয়ে রেল-কর্মীদের সাথে মীমাংসায় যাবার জন্য তাদেরই সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে সুরু করে। এই অবস্থায় রেলধর্মঘট আর কিছুদিন চললে ইন্দিরা সরকারের পক্ষে নতি স্বীকার করে রেলকর্মীদের সাথে একটা সম্মানজনক মীমাংসায় আসা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকত না। কারণ, এই সরকারের ব্যাঘ্র গর্জন শুধু একটি বাইরের আবরণ ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ, ঠিক যে সময়ে রেল-শ্রমিকরা প্রায় বিজয়ের মুখে এসে গিয়েছিল, সেই সময়েই রেল আন্দোলনের বর্তমান নেতৃত্ব যেভাবে নিজেরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়ে ইন্দিরা সরকারকে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে উদ্ধার করলেন, এবং তার দ্বারা রেল-শ্রমিকদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলেন, তাতে লেনিনের ভাষায় তাদের 'ওয়ার্স্ট্ ক্রিমিন্যাল' ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। বাস্তবে রেল ধর্মঘটের ক্ষেত্রে আগাগোড়া এই দলগুলি যে দৃষ্টভংগী প্রতিফলিত করেছে এবং আন্দোলনের চরম মুহূর্তে জাতীয় স্বার্থের দোহাই তুলে যেভাবে ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে, তাতে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, এই তিনটি দলই বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে গিয়েছে।

রেল ধর্মঘটের শিক্ষা

এইভাবে বিপুল সম্ভাবনাময় এতবড় একটা রেল ধর্মঘট এস পি, সি পি আই, সি পি আই (এম)—নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত এই তিনটি দলের চূড়ান্ত বুর্জোয়া সংস্কারবাদী এবং আপোষকামী মনোভাবের জন্য শোচনীয় পরিণতিতে পরিসমাপ্ত হয়। এই দলগুলি রেল ধর্মঘটের মনোবল এবং তার সমস্ত সম্ভাবনাকে যেমনভাবে স্তরে স্তরে প্রতিটি পদক্ষেপে নষ্ট করে দিয়েছে এবং এই আন্দোলনের মধ্যে যেরকম হীনতম ও দোদুল্যমান আচরণ করেছে, তা ইউরোপের মডারেট ট্রেড-ইউনিয়নিষ্টদেরও লজ্জা দিয়েছে। ইউরোপের মডারেটপন্থীরা, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা, এমনকি সরাসরি ইকনমিজমের চর্চাও যারা করে, অর্থাৎ যারা রাজনীতির এত বড় বড় কথা বলে না এবং বিপ্লবী বুকুনীর এত তুফান তোলে না, তারাও

যখন কোন আর্থিক দাবীদাওয়া নিয়ে মজুরদের একটা ধর্মঘটে নামায়, তখন সেই আন্দোলনে তারাও যে নীতি, সততা, সাহস এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করে এই সব দলগুলির তাও ছিল না।

তাছাড়া, সংশোধনবাদ যে গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে কত ধ্বংস ভূমিকা পালন করতে পারে, রেল ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ আর একবার পাওয়া গেল। দুনিয়ার প্রায় সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণী যেখানে ধর্মঘটী রেলশ্রমিকদের প্রতি চূড়ান্ত সংহতি প্রকাশ করে এগিয়ে এসেছিল, সেখানে সোভিয়েটের বর্তমান সংশোধনবাদী নেতৃত্ব এবং তাদের পেটোয়া পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি সংগ্রামী রেলশ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা দূরের কথা, ইন্দিরা সরকারের এহেন বর্বরোচিত আক্রমণের সামান্য প্রতিবাদটুকু পর্যন্ত করেনি। উপরন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, যখন বিশ লক্ষ রেলকর্মী ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে এইভাবে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত, সেই সময়ে শোধনবাদী সোভিয়েট নেতৃত্বের মুখপত্র 'প্রাভদা' কার্যতঃ রেল ধর্মঘটের বিরুদ্ধেই সকলকে এই বলে সতর্ক করে দেয় যে, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি নাকি এই রেলধর্মঘটের সুযোগ গ্রহণ করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে এবং ইন্দিরা সরকারের প্রগতিশীল কার্যক্রমগুলি বানচাল করার উদ্দেশ্যে রেল ধর্মঘটের পুরো সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। সংশোধনবাদী সোভিয়েট নেতৃত্বের কি অপূর্ব বিশ্লেষণ! সম্ভবতঃ, তাদের এই বিপ্লবী (!) মূল্যায়ণটিও সি পি আই কর্তৃক রেল ধর্মঘটকে চূড়ান্ত ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকরী পথনির্দেশক হিসাবে কাজ করেছে।

রেল ধর্মঘট নিঃসংশয়ে আর একবার প্রমাণ করেছে যে, এস পি তো একটি পরিচিত সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বটেই, এমনকি সি পি আই এবং সি পি আই (এম)-এর মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর সাথেও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলির কোন পার্থক্য নেই। সি পি আই'র জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সি পি আই (এম)-এর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল রাজনৈতিক লাইন দু'টি আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতিরই দু'টি ভিন্ন ধারা মাত্র। গণআন্দোলন কখনও কখনও, এমনকি মারমুখী রূপ নিয়ে পরিচালনা করলেও গণআন্দোলনগুলিকে তারা কখনই উন্নত রাজনৈতিক স্তরে পৌঁছে দিতে চায়না। বরং, গণআন্দোলনে তেমন সুযোগ দেখা দিলে 'জাতি বিপন্ন', 'দেশের লোকের অসুবিধা' প্রভৃতি নানা ধুয়া তুলে তারা পিছু হঠে এবং পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করে তার সমস্ত সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। আর, যখন গণআন্দোলনে খুব বেশী ঝুঁকি থাকেনা, অনেকটা রাষ্ট্রশক্তি এবং শাসক-

গোষ্ঠীর সাথে ভিতরে ভিতরে বোঝাপড়া থাকে, তখন অনেক লড়ালড়ির মহড়া দিয়ে, জেলে গিয়ে, গরম গরম বিপ্লবী শ্লোগান তুলে, তাকেই বিপ্লব বলে চালিয়ে সাধারণ মানুষ এবং অসচেতন কর্মীদের কাছে তারা মিথ্যা মোহ সৃষ্টি করে এবং পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে তাকেই ভাঙ্গিয়ে রাজা-উজির হয়। এইভাবে বিপ্লবের শিবিরের মধ্যে থেকে তারা সবসময়েই বিপ্লবের শক্তিশালী শত্রু হিসাবে কাজ করে এবং বার বার জনতার বিপ্লবের আকাংখাকে ভুল পথে পরিচালিত করে নিয়ে গিয়ে নিঃশেষ করে দেয়। তাই যতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের গণ-আন্দোলনগুলিকে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতির এই সমস্ত বিভিন্ন ধারার প্রভাব থেকে মুক্ত করে তার ওপর সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা না যাবে ততদিন পর্যন্ত গণআন্দোলন যত সম্ভাবনা নিয়েই গড়ে উঠুক না কেন, জনতার হাজার কোরবাণী এবং আত্মত্যাগ সত্বেও সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার হবেনা, তা বার বার মুখ থুবড়ে পড়বে এবং তার পিছনে ছুরিকাঘাত হবে যে কোন যুক্তির আড়ালে। এই কারণেই সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতির বিপজ্জনক দিকটিকে তুলে ধরে শ্রমিক শ্রেণীর মহান বিপ্লবী নেতা স্ট্যালিন দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষকে একদিন হুঁসিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন যে, তারা যদি তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে এই সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতিকে পরাস্ত করতে না পারে, তাহলে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা তাদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হবেনা। স্ট্যালিনের সেই উক্তি যে কতটা সত্য, এবারের রেল ধর্মঘট চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা আবার দেখিয়ে দিয়ে গেল।

তাই যারা শ্রেণী-সচেতন, যারা পুঁজিবাদী শোষণ থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করতে চান এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে এমন কায়দায় পরিচালনা করতে চান, যাতে জনতার রাজনৈতিক শক্তির উদ্ভব হয়, তাদের কাছে আমাদের আবেদন, আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে সি পি আই, সি পি আই(এম) সহ বিভিন্ন দলের মধ্য দিয়ে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতির এই যে বিভিন্ন ধারাগুলি কাজ করে চলেছে, সর্বশক্তি নিয়োগ করে সেগুলি পরাস্ত করতে এগিয়ে আসুন। গণআন্দোলনগুলির ওপর সত্যিকারের বিপ্লবী দলের, যাদের মূল রাজনৈতিক লাইন সঠিক এবং যারা যথার্থই মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী দৃষ্টিভংগীতে গণ আন্দোলনগুলি গড়ে তুলতে এবং পরিচালিত করতে সক্ষম, তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেই দলের শক্তিবৃদ্ধিতে কার্যকরী সাহায্য করুন। রেলকর্মীদের কাছেও আমাদের আবেদন, তারা তাদের গড়ে-ওঠা ঐক্য ও মনোবল অটুট রেখে এবং তাকে আরও সুদৃঢ় করে সরকারী সমস্ত

আক্রমণের মোকাবিলা করার সাথে সাথে সমস্ত ভয়ভীতি পরিত্যাগ করে সাহসের সাথে প্রতিটি শাখায় যাতে এই বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্য প্রচেষ্টা চালান। তবেই একমাত্র গণআন্দোলনগুলিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার মধ্য দিয়ে একদিন জনতার পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বহু আকাঙ্খিত স্বপ্নটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হবে। রেল ধর্মঘট এই শিক্ষাই আবার দিয়ে গেল।

পরিশিষ্ট

থ্রি-পয়েন্ট ফর্মূলা সম্পর্কে এ্যাকশান কমিটির কাছে প্রেরিত লোকসভার বিরোধী দলের নেতাদের চিঠির অনুলিপি

রেলশ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রামের — নয়া দিল্লী
জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক — ১১ই মে, ১৯৭৪
এবং সভ্যদের প্রতি

প্রিয় বন্ধু,

আপনারা অবগত আছেন যে, আমরা লোকসভার বিভিন্ন বিরোধী দলের সদস্যরা নিজেদের পদমর্যাদাবলে রেলধর্মঘট থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য গতকাল প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেছিলাম।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদগুলি দেখে আমাদের মনে হয়েছে যে, গতকালের সভায় বাস্তবে কি ঘটেছিল এবং আলাপ-আলোচনা থেকে যদি কোন প্রস্তাব এসে থাকে, তাহলে সেই প্রস্তাবগুলি কি ছিল, সে সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তি ঘটেছে।

আমরা সেজন্যে একথা আপনাদের কাছে জানানো আমাদের দায়িত্ব বলে মনে করি যে, সরকারের পক্ষ থেকে বর্তমান সংকট সমাধানের জন্য যে প্রস্তাব ছিল তা হচ্ছে, নিম্নলিখিত থ্রি-পয়েন্ট ফর্মূলাটি একই সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে।

* জেলে আটক এন সি সি আর এস-এর নেতাদের মুক্তি,
* আলোচনা পুনরারম্ভ, এবং
* ধর্মঘট প্রত্যাহার

আমরা অবশ্য সরকারকে জানিয়ে দিয়েছি যে, উপরোক্ত ফর্মুলার ওপর কোন সিদ্ধান্ত একমাত্র এন সি সি আর এস-ই গ্রহণ করতে পারে, অন্য কেউ নয়।

সুতরাং, এ ব্যাপারে আপনাদের বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমরা এই সংবাদটি আপনাদের কাছে পাঠালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত

স্বাক্ষর—এস এন মিশ্র (কং সংগঠন), জগন্নাথ রাও জোশী (জনসংঘ), ভূপেশ গুপ্ত (সি পি আই), ত্রিদিব চৌধুরী (আর এস পি), সমর মুখার্জি (সি পি এম), নীরেন ঘোষ, (সি পি এম), মধু দণ্ডবতে (সোস্যালিষ্ট পার্টি)

লোকসভার বিরোধী দলসমূহের নেতাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত স্মারকলিপির অনুলিপি

১৮ই মে, ১৯৭৪

বিষয় :—রেল ধর্মঘটের মীমাংসার ব্যাপারে
প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

আমরা লোকসভার বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ রেলধর্মঘট সম্পর্কে নিম্নলিখিত মতামত পেশ করছি :

(১) আমরা অনুরোধ করছি সরকার যেন কোনরকম অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ না করে, এবং রেলশ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে একটা সম্মানজনক মীমাংসায় উপনীত হয়।

(২) এই উদ্দেশ্যে রেলশ্রমিক-কর্মচারীদের বিরোধের বিষয়টি অবিলম্বে আলাপ-আলোচনার বৈঠকে আনা উচিত এবং রেলশ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রামের জাতীয় সমন্বয় কমিটির এ্যাকশান কমিটির সদস্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা পুনরারম্ভ করা উচিত।

(৩) রেলকর্মী পরিবারগুলির মহিলাদের ওপর হয়রানী, উচ্ছেদের জন্য ভীতিপ্রদান, দলে দলে গ্রেপ্তার এবং শাস্তিপ্রদানসহ রেলশ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর অভাবনীয় নিষ্ঠুরতা আমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রত্যক্ষ করেছে। আমরা দাবী করছি যে, এই অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ করা হোক্।

(৪) আমরা মনে করি, যদি সরকার দ্রুত এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করে, তাহলে রেলশিল্পে বর্তমানে যে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে, তা ভাঙবার উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে।

শ্রদ্ধার সহিত,

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাক্ষর—এস এন মিশ্র (কংগ্রেস সংগঠন), ভূপেশ গুপ্ত, হীরেন মুখার্জী (সি পি আই), জ্যোতির্ময় বসু, সমর মুখার্জী (সি পি এম), ত্রিদিব চৌধুরী (আর এস পি), এরা সেখিয়ান (ডি এম কে), দিগ্‌বিজয় নারায়ণ সিংহ (কংগ্রেস সংগঠন), জগন্নাথ রাও জোশী (জনসংঘ), রবি রায় (এস এস পি), মধু দণ্ডবতে (এস পি)।

তিহার জেল থেকে প্রেরিত প্রস্তাবের (ধর্মঘট প্রত্যাহার সংক্রান্ত) পূর্ণপাঠের অনুলিপি

সরকারের সমস্ত আক্রমণ, যে ধরণের আক্রমণ এর আগে ভারতীয় শ্রমিক-শ্রেণী আর কখনও প্রত্যক্ষ করেনি, তা উপেক্ষা করে রেলকর্মীরা যে সাহস এবং দৃঢ়তার সহিত তাদের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, এন সি সি আর এস-এর এ্যাকশান কমিটি তার জন্য তাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে। পঞ্চাশ হাজারের অধিক কর্মীকে বেআইনী ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে; দশ হাজারেরও অধিক ব্যক্তির উপর হাঁটাইয়ের আদেশ জারী করা হয়েছে; প্রায় ত্রিশ হাজার রেলকর্মীকে তাদের অসহায়, নির্দোষ স্ত্রী-পুত্র ও জিনিষপত্র সহ বাসস্থান থেকে বহিস্কৃত করা হয়েছে, আইনশৃংখলার রক্ষকদের দ্বারা মহিলারা ধর্ষিতা হয়েছে; রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং জনগনের অর্থে সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ ব্যয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার রেলকর্মী ও তাদের নেতৃত্বকে জনসমক্ষে হেয় করার জন্য গোয়েবল্‌সীয় কায়দায় অকল্পনীয় হীন কুৎসা ও মিথ্যা ছলনার এক প্রচার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে; সেনাবাহিনী, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, টেরিটোরিয়াল আর্মি, স্পেশাল রিজার্ভ পুলিশ, সি আর পি ও রাষ্ট্রশক্তির অন্যান্য যন্ত্রগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'মিসা', যুদ্ধকালীন 'ডি আই আর' প্রভৃতি দানবীয় আইনগুলিকে নির্বিচারে প্রয়োগ করা হচ্ছে, বেয়নেট উঁচিয়ে শ্রমিকদের জোর করে কাজে লাগানো হচ্ছে; অনাহারে রেখে শ্রমিকদের নতি

স্বীকার করানোর উদ্দেশ্যে তাদের অর্জিত বেতন পর্যন্ত আটকে রাখা হচ্ছে। রেলকর্মীদের ন্যায্য এবং সঙ্গত দাবীগুলির মোকাবিলা করতে সরকার এই সব কয়টি পন্থা অবলম্বন করেছে। এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে অভূতপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে রেলকর্মীরা এবং তাঁদের পরিবারবর্গ তাদের অধিকার রক্ষা ও অর্জনের সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, তার তুলনা সারা দুনিয়ার শ্রমিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে বিরল।

কমিটি লক্ষ্য করছে যে, দেশের ভিতরের ও বিদেশের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনগুলির পক্ষ থেকে রেলকর্মীদের ন্যায্য এবং সঙ্গত দাবীগুলি মেনে নেওয়ার জন্য এবং তাদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন বন্ধ করার জন্য সরকারের নিকট যে সমস্ত আবেদন জানানো হয়েছে, সরকার সে আবেদনে সাড়া দেয় নি। সমস্ত বিরোধী দল নির্বিশেষে শ্রমিক-বিরোধী পন্থা অনুসরণে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি যে আবেদন করেছে, সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। সরকারের প্রতি বরাবর সহানুভূতিশীল দেশের সংবাদপত্রগুলি রেলকর্মীদের দাবীগুলি সম্পর্কে একটা যুক্তিসঙ্গত ও আপোষমুখী মনোভাব গ্রহণের জন্য সরকারকে বারবার বোঝানোর যে চেষ্টা করেছে, তা সরকারকে বিচলিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। জয়প্রকাশ নারায়ণের মত নেতা এবং অন্যান্য জননেতারা বিরোধের মীমাংসা করে নেওয়ার জন্য যে আবেদন জানিয়েছেন, তাও সরকারকে তার একগুঁয়েমি থেকে টলাতে পারেনি। সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক, এমনকি ভারতের রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এবং জোরের সঙ্গে রেলকর্মীদের সঙ্গে মিটমাট করে নেবার যে উপদেশ দিয়েছেন, সরকার তাকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উপেক্ষা করেছে।

এ্যাকশান কমিটি আর একবার জোরের সঙ্গে একথা ঘোষণা করছে যে, রেলকর্মীরা কখনই ধর্মঘট চাননি। একটা রেল ধর্মঘটের যে কি বিপর্যয়কর অর্থ নৈতিক পরিণতি ঘটতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁরা অন্য যে কোনও ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর সচেতন। আমরা যা চেয়েছিলাম এবং যার জন্য লড়ছিলাম, তা হচ্ছে, আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি সম্পর্কে একটা মীমাংসায় আসা। সরকারই তার কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণের দ্বারা রেলকর্মীদের উপর এই ধর্মঘটটি জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপগুলি এত সম্প্রতি ঘটেছে যে, এগুলির এখানে আর পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যখন রেলকর্মীরা এমনকি একটা সাধারণ নির্ভেজাল শ্রমিক আন্দোলন চালাচ্ছিল, সরকার তখন আচমকা গ্রেপ্তার-আটক থেকে সুরু করে রেলকর্মীদের কলোনীগুলিতে ব্যাপক 'কুম্বিং' অপারেশন চালিয়ে ছোটখাটো একটা যুদ্ধ

পরিচালনা করেছে। এই ধরণের মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলাফল স্বভাবতঃই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে না গিয়ে পারেনা। এই ধর্মঘটের মাধ্যমে যদি কিছু অভিব্যক্তি ঘটে থাকে, তবে তা হচ্ছে, বারবার আমরা যা ঘোষণা করেছি, রেলকর্মীদের ন্যায্য এবং যুক্তিসংগত দাবীগুলি আদায় করা। এ ছাড়া আমাদের কার্যক্রমের পিছনে আর অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

কমিটি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, কিভাবে ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি ঘটানো যায়, এ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিতে এন সি সি আর এস-এর সদস্যদের কারাগারে অভ্যন্তরে বা বাইরে কোথাও মিলিত হ'তে দিতে সরকার অস্বীকার করছে। এর দ্বারা এ্যাকশান কমিটির সামনে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কারণ, সমস্ত প্রকার আলাপ-আলোচনা চালাবার এবং পরবর্তীকালে ধর্মঘট পরিচালনার দায়িত্ব এ্যাকশান কমিটির উপরেই ন্যস্ত হয়েছিল। সাংবিধানিক দিক থেকে, ধর্মঘট আহ্বান বা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র এন সি সি আর এস-এর পূর্ণ বৈঠকই নিতে পারে, যার অধিকাংশ সদস্যই এখন হয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জেলে আটক আছেন, নতুবা আইনের হাত হতে পলাতক অবস্থায় আছেন।

সমস্ত জোনাল রেলওয়েগুলিতে ও রেলের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘটের পরিস্থিতি সম্পর্কে এ্যাকশান কমিটি গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছে এবং ধর্মঘট আরও চালালে তার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক পরিণতির কথাও চিন্তা করেছে এবং এই অবস্থায় কমিটির উপর যে দায়িত্ব বর্তেছে, সে সম্পর্কে সচেতন থেকে এ্যাকশান কমিটি ২৮শে মে সকাল ৬টা থেকে একতরফাভাবে ধর্মঘট প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছে। কমিটি সমস্ত রেলকর্মীকে ঐ সময় থেকে কাজে প্রত্যাবর্তন করতে এবং রেল চলাচলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের প্রত্যেকের ক্ষমতাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রয়োগ করতে আহ্বান জানাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে এ্যাকশান কমিটি রেলপথে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য, ধর্মঘট সূত্রে ধৃত সমস্ত রেলকর্মী ও অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি, ধর্মঘটের প্রাক্কালে ও ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে যে সমস্ত শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করা হয়েছে তাদের পুনর্বহাল, রেলকর্মী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে গৃহীত সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রত্যাহার; রেলকর্মীদের কোয়ার্টারগুলি প্রত্যর্পণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট আহ্বান জানাচ্ছে।

একই সঙ্গে, রেলকর্মীদের সমস্ত বকেয়া দাবীগুলি সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে একটা আপোষ মীমাংসায় আসার উদ্দেশ্যে এন সি সি আর এস-এর

নিগোশিয়েটিং কমিটির সঙ্গে পুনরায় আলোচনা সুরু করার জন্য এ্যাকশান কমিটি রেল মন্ত্রককে আহ্বান জানাচ্ছে।

এ্যাকশান কমিটি রেল কর্মীদের আশ্বস্ত করছে যে, তাদের ন্যায্য এবং সঙ্গত দাবী আদায়ের সংগ্রামে কমিটি পূর্বের ন্যায় ঐক্যবদ্ধই আছে। রেলকর্মীরা তাদের দাবী আদায় না করা পর্যন্ত, সারা দেশের লক্ষ লক্ষ রেলকর্মীর রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে লক্ষ্য ও সংগ্রামের যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে কোনও অবস্থাতেই দুর্বল হতে দেওয়া চলবে না। কমিটি রেলকর্মীদের এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অবিচলিত থাকতে আহ্বান জানাচ্ছে যে, এখনও পর্যন্ত একমাত্র তাদের বাহিনীর ভিতরই যে শত্রুর অবস্থান, সেই শত্রু ছাড়া অন্য কোন শক্তিই তাদের পরাজয় আনতে পারে না। গত কয়েক সপ্তাহের সংগ্রামের শিক্ষা প্রতিটি রেলকর্মীকে নিতে হবে এবং অবিলম্বে নিজেদের বাহিনীর মধ্যে ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এ্যাকশান কমিটি রেলকর্মী সংগ্রামের শহীদ কম্‌ ভি. এ. মহালিঙ্গি, কম্‌ শ্রীপাল ত্রিবেদী এবং কম্‌ রামস্বামীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। কম্‌ রামস্বামী, যার উপর দিয়ে রেল ইঞ্জিন চালিয়ে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, তার চরম আত্মত্যাগ চিরকাল দেশের রেলশ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবি জনগণকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের চিরন্তন লড়াইয়ে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে ও সর্বস্ব ত্যাগে অনুপ্রাণিত করবে।

রেলকর্মীদের সংগ্রামে, তাদের দুঃখ-কষ্টে, অভাব-অসুবিধায় যে সমস্ত ট্রেডইউনিয়ন সংগঠন, যুব সংগঠন, রাজনৈতিক দল, মহিলা সংগঠন, সংবাদপত্র, সাংবাদিক ও অন্যান্যরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, এ্যাকশান কমিটি তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। কমিটি শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবি জনগণকে এই আশ্বাস দিচ্ছে যে, সুখী ও সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের জন্য জনগনের লড়াইয়ে রেলকর্মীরা সর্বদাই পুরোভাগে থাকবেন।

কমিটি প্রস্তাব করছে যে, সভা আহ্বান করার মতো অনুকূল পরিস্থিতি দেখা দিলেই এন সি সি আর এস-এর বৈঠক আহ্বান করা হবে।

স্বাক্ষর—এইচ এস চৌধুরী, জে পি চৌবে, পার্বতী কৃষ্ণাণ, শ্রীকৃষ্ণ, জর্জ ফার্নাণ্ডেজ (জোনের মধ্যে এ্যাকশান কমিটির সদস্যবৃন্দ)। ভি ভি বশিষ্ট (জোনের মধ্যে এন সি সি আর এস-এর সদস্য—এ্যাকশান কমিটির সদস্য নন)।

এস ইউ সি'র প: ব: রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড রণজিৎ ধর কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স (প্রা:) লি: ৫২বি, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

দাম: ৬০ প: